আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

২০০০

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সে ও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিক তার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।"

— রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?
ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান
মোর মার।"

— কাজী নজরুল ইসলাম

সোনালী পাতা

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক - অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

SPORT

14 1 OCTOBER 2000 THE SUNDAY STATESMAN

Ashutosh College champions

CALCUTTA, Sept. 30. — Ashutosh College secured the Heramba Moitra Memorial Shield defeating Prafulla Chandra College 1-0 at Calcutta University ground today. Samar Das scored the match-winner halfway through the first session. Sourav Ghosh of the losers wasted several scoring opportunities. — SNS.

চ্যাম্পিয়ান টিমের সদস্যরা ঃ- বাদিক থেকে বসে- নবজ্যোতি সরকার, বিকাশ দাস, সমীর দাস, রণজিৎ সর্দার, ঈশ্বর চন্দ্র বেরা, সুকান্ত পাত্র।
বাঁদিক থেকে দাড়িয়ে মোস্তাকিম মোল্লা, রাজু পাল, নির্মল মণ্ডল, নয়ন দে (অধিনায়ক) শঙ্কর চৌধুরি, মন্টু প্রাসাদ (অরবিন্দ) কাজল দাস, শম্ভু বর, ইন্দ্রজিৎ বর্মন, সমর দাস ও শ্রীকান্ত নস্কর।

গোল হওয়ার সোনালী মুহূর্ত

জয়ের পর কলেজ টেন্টে পতাকা উত্তোলন করলেন অধ্যাপক - অংশুতোষ খাঁ

জয়ের পর উল্লসিত কলেজ ছাত্ররা

শিল্ড নিয়ে ঃ- বাদিক থেকে বসে ঃ বিকাশ দাস, কণিষ্ক রায়চৌধুরী, শুভাশিস দাস।
বাদিক থেকে দাড়িয়ে ঃ কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীব অধিকা
সুমিত সাহা ও সজল বসাক।

কলেজ টেস্টের সামনে অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁয়ের সঙ্গে ছাত্ররা

কোচ সুমিত বাগচীকে নিয়ে খেলোয়াড়দের উল্লাস।

With Best Compliments From :

ASUTOSH COLLEGE COMPUTER CENTRE IN ASSISTANCE WITH THE INSTITUTE OF –

COMPUTER ENGINEERS (INDIA)

10, BASANTA BOSE ROAD, CALCUTTA - 700 026
DIAL : 485-2808

COURSES OFFERED :

DOEACC	O	LEVEL	(1 year/ Rs. 6500)
DOEACC	A	LEVEL	(1½ year/ Rs. 1600)
DOEACC	CCC	LEVEL	(3 months/ Rs. 2050)
MS OFFICE			(3 months/ Rs. 2050)
DTP			(3 months/ Rs. 3050)
FA			(4 months/ Rs. 4050)

SPECIAL COURSE : E - Commerce

Special offer for college students

O Level – Rs. 6050

A Level – Rs. 15600

At a time payment – 5% discount

Scholarship for Meritorious Students

With Best Compliments From :

ASUTOSH COLLEGE TRAINING CENTRE

10, BASANTA BOSE ROAD, CALCUTTA - 700 026
(OPP. to the Northern Side of College Building)
DIAL : 485-2808

COURSES OFFERED :

1. NET / SLET
2. Course in Management (with the assistance of Peerless)

   (Business, Marketing, Travel-Tourism and Ind. Safely – affiliated to WBSCTE)
3. I.A.S. (Prelims. + Mains)
4. WBCSC (Prelims. and Mains)
5. English for Communication.
6. Aptitude Test and Career Cousenlling.
7. Various Computer Courses.

Time – 4.30 p.m. to 7 p.m. (from Monday to Friday)

Prof. AMRITAVA BANERJEE

PRINCIPAL ASUTOSH COLLEGE AND
CHAIRMAN ASUTOSH COLLELGE TRAINING CENTRE

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

স্থাপিত — ১৯১৬

২০০০

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬
দূরভাষ ঃ ৪৫৫-৪৫০৪

◆ বিষয়সূচী ◆

কবিতা সংকলন ঃ—

হৈ-হুল্লোড় ☐ দেবাশীষ সোম ১২
কবিতাগুচ্ছ ☐ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১২
সেই কথাখানি ☐ সৌম্য দাস ১৩
হত্যাপ্রসঙ্গে ☐ পার্থিব বসু ১৩
প্রতিশ্রুতি ☐ কৌশিক চক্রবর্তী ১৪
অব্যক্ত প্রেম ☐ শুভঙ্কর কর ১৫
নিছক দর্শক ☐ আবুসাব রহমান ১৫
ধূসর বসন্ত ☐ দেবাশীষ মণ্ডল ১৫
অপেক্ষা ☐ লক্ষী নস্কর ১৬
আমি একটা ক্যাকটাস ☐ শ্রাবন্তী পাল ১৬
রাতের শব্দে ☐ অরিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৬
এক শিশুর প্রতি ☐ সন্দীপ দে ১৭
জীবন-মৃত্যু ☐ অনির্বাণ রায় ১৭
কবি সুকান্ত স্মরণে ☐ অনন্য ভট্টাচার্য ১৮
তীর্থব্রত ☐ অমল চক্রবর্তী ১৮
বণ্যাপ্রসঙ্গে ☐ সজল বসাক ১৮
শোকগাথা ☐ অমল চক্রবর্তী ১৯
বিনিময়ে ☐ সম্রাট সেনগুপ্ত ১৯
এখানে নেই ☐ রূপা বর্দ্ধন ২০
জীবনযুদ্ধ ☐ কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় ২০
An Elegy ☐ রমেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯
Flying Dream ☐ জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র ২০
A Special Friend ☐ সুচন্দ্রা সিনহা রায় ২০
Life Should be a Beautiful Dream ☐ ক্ষুদিরাম মল্লিক ২১
Nemo ☐ দেবাশীষ দেব ২১
Tonight ☐ শুভম মুখোপাধ্যায় ২১
Who is the Loser ☐ জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র ২১

গল্প ঃ—

ফুল ফোটার গল্প ☐ অমিত কংসবণিক ২২
মিথ্যে আশ্বাস ☐ অভিষেক ঘোষ ২৫
একটি বৃষ্টির গল্প ☐ সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী ২৬

নির্বাচিত প্রবন্ধ ঃ—

ভারতীয় ক্রিকেটের অধঃপতন ☐ রুম্পা চৌধুরী .. ২৯
সমাজ এবং সামাজিক অবক্ষয় ☐ দিলীপ কুমার মাইতি ৩০
আমাদের দায়িত্ব ☐ অনুজ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩
Communalism : A curse for modern India ☐ পল্লব গুহ ৩৬
Politics for Beginers ☐ সৌমিত্র ঘোষ ৩৭
A boy's Knowledge, Resignation and defenitions ☐ রাকেশ দীক্ষিত ৩৮
The New Horizon ☐ সপ্তর্ষি বিশ্বাস ৩৯
Drug Addicition ☐ সুস্মিতা সরকার ৩৯

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ঃ—

চিরনবীনতায় হরমোন ☐ স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী ৪০
Anti Influenza Drug ☐ অভিরূপ মুখোপাধ্যায় ৪২
The Extinat Animals of the Past ☐ সায়ন্তন সরকার ৪৩
মশাবাহিত যে রোগটি ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায় ☐ সজল ভট্টাচার্য্য ৪৪

ভিন্ন স্বাদের গদ্য ঃ—

বাংলা ভাষার সঙ্কট—উত্তরণের দিশা ☐ পল্লব মুখোপাধ্যায় ৪৫
পিথো ☐ স্বপন কুমার দাস ৪৯

ভ্রমণ ঃ—

হয়তো কাকতালীয় ☐ সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত ৫৩
লাল মাটির দেশে ☐ তপন পোদ্দার ৫৫

ক্রীড়া সম্পর্কিত ঃ—

সাক্ষাৎকার — প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক ৫৮

সমসাময়িক ঃ—

চীন ও কিউবাকে অভিনন্দন

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

বর্ষ : ১৯৯৯-২০০০

সভাপতি ঃ
অধ্যাপিকা ডঃ সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত

সাধারণ সম্পাদক ঃ
শ্রী কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়

সহ সভাপতি ঃ
শ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ -সাধারণ সম্পাদব
সর্বশ্রী অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়
রাহুল কানুনগো

ক্রীড়া সম্পাদক ঃ
সর্বশ্রী সঞ্জীব অধিকারী
রাণা সাহা

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ
সর্বশ্রী সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী,
অভিরূপ মুখোপাধ্যায়

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (অন্তর্বিভাগ) ঃ
সর্বশ্রী অভিরূপ দাশগুপ্ত
সুদীপ্ত দাস

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ
সর্বশ্রী রাজদীপ মণ্ডল
সমিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা সম্পাদক ঃ
সর্বশ্রী প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (বহির্বিভাগ) ঃ
সর্বশ্রী সৌম্যদীপ পাল
রবি সিং

সাধারণ ঘর (মহিলা) সম্পাদক ঃ
শ্রীমতি কস্তুরী গঙ্গোপ্যাধ্যায়

গ্রন্থাগার সম্পাদক ঃ
শ্রী শিবেন্দু চক্রবর্তী

ছাত্রাবাস সম্পাদক ঃ
শ্রী মলয় ঘোষাল

সাধারণ ঘর সম্পাদক ঃ
শ্রী অর্ণব দাশগুপ্ত

অন্যান্য সদস্য ঃ
সর্বশ্রী কৌশিক চক্রবর্তী
রাজেশ গোস্বামী
সুমিত সাহা
ও সজল বসাক

খাবার ঘর সম্পাদক ঃ
শ্রী মলয় দে

ছাত্র কল্যাণ ঃ
শ্রী চন্দ্রকান্তি দত্ত

পত্রিকা দপ্তর

উপদেষ্টা	ঃ	অধ্যক্ষ শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকমণ্ডলী (শিক্ষক)	ঃ	সর্বশ্রী ডঃ স্বপন কুমার দাস, শ্রী অমল চক্রবর্তী ও শ্রীমতি রাইকমল দাশগুপ্ত
কার্যনির্বাহী সম্পাদক	ঃ	শ্রী পল্লব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদকমণ্ডলী (ছাত্র)	ঃ	সর্বশ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মাধক্ষ্য	ঃ	শ্রী সজল বসাক
পৃষ্টাসজ্জা	ঃ	সম্পাদকমণ্ডলী
প্রচ্ছদ	ঃ	শ্রী পল্লব মুখোপাধ্যায়
বিশেষ সহযোগিতা	ঃ	অধ্যাপক শ্রী অংশুতোষ খান ও অধ্যাপিকা শ্রীমতি সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত
প্রকাশক	ঃ	অধ্যক্ষ শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
মুদ্রক	ঃ	কোয়ালিটি অফসেট প্রিন্টার্স ২৯, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
বিশেষ কৃতজ্ঞতা	ঃ	শ্রী শ্যামল ঘোষ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং সর্বশ্রী শুভাশীষ দে, সঞ্জীব অধিকারী, ভাস্কর ঠাকুর, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, বিনোদ রায়, সুনভ ভট্টাচার্য প্রমীত ঘোষ, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, অয়ন ধামাইতকন্নি, বিক্রম হালদার, অভিজিৎ চক্রবর্তী, দীপেন্দু মুখুটি, জুলফিকার আলি কাইফি, কৌশিক চক্রবর্তী, সন্দীপ দে, অভিষেক রায়, অয়ন সরকার, অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়, সুমিত সাহা, রাণা সাহা, অভিষেক ঘোষ, রাহুল কানুনগো, নীলাদ্রি, সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু ভৌমিক ও কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি

কলেজের অধ্যাপক — ঁ সুনীল সিদ্ধান্ত (রসায়ন)

ও শিক্ষাকর্মী — ঁ খগেন দাস (দাশুদা)

এঁদের প্রয়াণে আমরা গভীর মর্মাহত, শোকস্তব্ধ ।

অধ্যাপক পতিত পাবন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইংরেজি)-এঁর মরণোত্তর দেহদানে আমরা গর্বিত ।

তবু অনন্ত জাগে

যাঁদের সম্পন্ন জীবন ও সৃজন আমাদের প্রাণিত করেছে গভীরভাবে—

কবি অরুণ মিত্র
বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী
গীতা মুখোপাধ্যায়
উস্তাদ আল্লারাখা
শান্তিদেব ঘোষ
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
বসন্ত চৌধুরী
মণিন্দ্র রায়
দেবকুমার বসু
অশোক মিত্র (অভিনেতা)
অমর গঙ্গোপাধ্যায়
বিদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়
পি.আর. কুমারমঙ্গলম
অসিত মুখোপাধ্যায়
আনন্দ শঙ্কর
মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার

যাঁদের সাফল্যে আমরা উজ্জীবিত

মহাশ্বেতা দেবী
নবনীতা দেবসেন
ঝুম্পা লাহিড়ি
বুলা চৌধুরী
কর্ণম মালেশ্বরী
গুরচরণ সিং
বীণা মল
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়
সীমা অ্যান্টিল
দীপ সেনগুপ্ত
এবং
কলেজের ফুটবল দল

প্রকাশকের কথা

অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ আশুতোষ কলেজ

কলেজ পত্রিকা প্রকাশ হ'ল এক বিশিষ্ট নির্মাণ কর্ম— ব্যাপক অর্থে এ এক সাংস্কৃতিক নির্মাণ। এই সাংস্কৃতিক নির্মাণ কর্ম পরিচালিত হয়েছে তারুণ্যের দীপ্তি নিয়ে। উদ্যোগপর্ব থেকে শুরু করে পত্রিকা বণ্টন পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব তাদেরই যারা এযুগে ভোটের অধিকার পেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও প্রাপ্তবয়স্ক নয়। তাই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের কোন ত্রুটি বিচ্যুতির কথা এখানে বলতে চাই না। ১৮-২০ বছরের এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর এই নির্মাণ কর্মকে আমরা প্রাথমিকভাবে কেবল অভিনন্দনই জানাব ।

গদ্য-পদ্য নিয়ে এই যে পত্রিকা নির্মাণ তাতে যেমন সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে, তেমনি এর মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চিন্তা-কল্পনা সংগঠিত করার সুযোগ পাচ্ছে। মানুষের পরিচয় তার চিন্তা-ভাবনা সংহত ও সুগঠিত করার ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। তাই কলেজ পত্রিকার কিছু বৌদ্ধিক আবেদনও রয়েছে, যেমন তাতে আছে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের প্রকাশ।

একুশ শতকের সূত্রপাত হতে চলেছে যখন তখন ৮৫তম বছরের প্রবীণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই উপহারটি সকলের মনে আগ্রহের সঞ্চার করবে, একে সকলেই কালোপযোগী মনে করবে এটাই আশা করব। কালোপযোগী বলার অর্থ এই নয় যে অতীতের ভাবনা-চিন্তা সব বর্জন করতে হবে। বিজ্ঞান ও যুক্তি-বিচারের প্রাধান্য মেনে নেওয়াটাই আসল কথা । অতীতে বিজ্ঞান চিন্তা ছিল না এমন নয়। আগের দিনের মানুষের চিন্তায় যুক্তি বিচার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত একথা বলা যাবে না। তবে কিনা আগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল কতিপয় চিন্তাশীল মানুষের চর্চ্চার বিষয় মাত্র। এখন আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গেই বিজ্ঞান যুক্ত হয়েছে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এটাই মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে জীবন চর্য্যার সঙ্গতি প্রয়োজন ।

কলেজ পত্রিকা হল শিক্ষাশ্রয়ী সংস্কৃতি। আমাদের দেশে অগণিত মানুষ রয়েছে যাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। তাদের সংস্কৃতি তথা জীবনধারাগত ক্রিয়াকলাপে বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব প্রকট। অবশ্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পরও কিছু কিছু মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞান সচেতন হয় না, তাদের জীবন ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় না। তথাপি শিক্ষার প্রসারই হবে আমাদের প্রধান সামাজিক এজেন্ডা যার কথা রামমোহন থেকে অমর্ত্য সেন সকল চিন্তাশীল মানুষই বলেছেন। আর আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা যে এজেন্ডাকে সারাজীবন অনুসরণ করবে তা' হল সর্বত্র এবং সবসময়েই বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কল্পে আপোষহীন ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা ।

সম্পাদকীয় কলমে

নতুন শতক ও সহস্রাব্দের প্রথম শারদোৎসব এসেছে। আমাদের শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সমস্ত লেখক, পাঠক ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে। ঋতুচক্রের আবর্তে শরতের আগেই অবশ্যম্ভাবী বর্ষা, উৎসবের মরসুম বয়ে এনেছে বাংলা-অঞ্চের বানভাসী মানুষের সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। বন্ধ বা বন্ধ হতে যাওয়া শিল্প-কলকারখানার কর্মীদেরও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মিশে আছে উৎসবের আকাশে, বাতাসে। তবু আলোতে, ঢাকের বাজনায়, রংবেরং-এর পোশাকে ধরণ বদলায় পরিবেশের।

নতুন শতকের সূচনাতে বিদায়ী শতাব্দীর কিছু বকেয়া সমস্যা ঠিকই মাথা চাড়া দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও বিজ্ঞান সচেতনতার অভাব। চলতি আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে সমাজে দরিদ্র অংশে আরো দরিদ্র হয়েছে, ধনীর ভাণ্ডার আরো স্ফীত হয়েছে ঐশ্বর্যে। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা রচনা, সম্পদের সুষম বণ্টন হোক আমাদের নতুন শতকের সঙ্কল্প। আর্থিক স্বয়ম্ভরতার প্রবল ঢক্কানিনাদে অবাধ বাণিজ্যের খোলা হাওয়ায় ক্রমশঃ ধ্বস্ত হয়ে পড়েছে আমাদের দীর্ঘলালিত রুচি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ইন্দ্রজালে বাঁধা পড়ছে আমাদের মনন ও চৈতন্য। চোখের সামনে পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে এক ঝাঁচকচকে পণ্যবাদী দুনিয়া। আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সবকিছুই পরিণত হয়েছে ভোগ্যপণ্যে। স্পনসরশিপ, ফিন্যান্স প্রভৃতি গালভরা শব্দগুলো ক্রমশঃ ঢুকে পড়েছে আমাদের মগজে। সারাদিনরাতব্যাপী উপগ্রহের চ্যানেলগুলোয় অবাধে প্রদর্শিত নাচ-গান-হই-হুল্লোড়-তাৎক্ষণিক আমোদ ভরপুর অনুষ্ঠান হিংস্রতা-অশ্লীলতা-যৌনতা সমৃদ্ধ সিরিয়াল, চলচ্চিত্র স্তব্ধ করে দিচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের সন্ধানার পথ, ধ্বংস করছে গঠনমূলক সাংস্কৃতিক বাতাবরণ। জনপ্রিয় চ্যানেলগুলোয় বাদ পড়ছেন রবীন্দ্র-নজরুল, বাংলা সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যের গণ ও লোকসংস্কৃতি প্রাধান্য পাচ্ছে না। একই সঙ্গে বিপণন আর বিজ্ঞাপনে ঢেকে যাচ্ছে গ্রাম-গঞ্জ শহর-মফঃস্বলের মুখচ্ছবি। বিজ্ঞাপনগুলোও যেন এক বিশেষ স্বপ্নরাজ্য থেকে আমদানী করা এক বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অন্ধ দেশীয় অনুকরণ। এই অবক্ষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে হবে ছাত্রসমাজকে, জ্বালাতে হবে দেশের ও রাজ্যের সুমহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মশাল।

ধর্মীয় বাতাবরণের নাগপাশ ছিন্ন করে শারদোৎসব আজ এক মহামিলনের উৎসব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের অন্যত্র যখন দাঙ্গা-অস্থিরতা-রক্তক্ষয়-বিশৃঙ্খলায় জেরবার, তখন বাংলা ও বাঙালির জীবনে এই মিলন উৎসব ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে একান্ত জরুরী। বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ, সমন্বয়ী ঐতিহ্য ভাঙার হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, তাই উৎসবের বর্ণময় দিনগুলোতে আমাদের বিশেষ ভাবে নজর রাখা প্রয়োজন যাতে অশুভ শক্তি কোনভাবে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। একুশ শতক সমস্ত মানুষের জীবনে নিয়ে আসুক শান্তি, স্বনির্ভরতা, সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্য—এ আশা রইল।

শারদোৎসব ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ., বি.এস.সি. (সাম্মানিক ও সাধারণ) পার্টওয়ান-২০০০ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ প্রায় জমজ সহোদর হয়ে পড়ায় আশুতোষ কলেজ পত্রিকা প্রকাশ রীতিমত সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এরই সাথে ছিল নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির বিষয়। তাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ ও শিক্ষাকর্মীগণের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে লেখা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই আশুতোষ কলেজ—পত্রিকা-২০০০ প্রকাশ সম্ভব হল। পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই সমান্তরালে মাননীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের অনুভবী কবিতা ও প্রবন্ধ সঙ্কলনে সমৃদ্ধ হয়েছে পত্রিকার পাতা— এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। কলেজের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ও সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, পত্রিকা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। প্রিয় পাঠকগণের গঠনমূলক সমালোচনা আগামী দিনে পত্রিকার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করবে। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের বল, সমালোচনা আমাদের চিন্তার রসদ, প্রশ্রয় আমাদের শক্তি ও স্পর্ধা।

পল্লব মুখোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে।

সাধারণ সম্পাদকের (ছাত্র সংসদ) কলমে

প্রথমেই আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদের তরফ থেকে সমস্ত অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাগণ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে জানাই শারদীয়ার সন্নত প্রণাম ও ছাত্রছাত্রীদের জানাই শারদোৎসবের অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশুতোষ কলেজ পত্রিকা ২০০০ প্রকাশিত হল। পত্রিকা প্রকাশের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের পাশে পরম সুহৃদের মত দাঁড়িয়েছেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাগণ পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এরই সমান্তরালে আমরা পেয়েছি কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা। এই সহযোগিতা না পেলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে রক্তদান শিবির পালন করা সম্ভব হত না । ১৯৯৯-২০০০ বছরের ছাত্র সংসদ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, প্রভৃতি বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল এবং বলা বাহুল্য প্রতিটি কর্মসূচীই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়ায়। এরই পাশাপাশি আন্তঃকলেজ ক্রিকেট, ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলেজ অংশগ্রহণ করেছে। প্রথামাফিক বার্ষিক মুখপত্র 'আশুতোষ কলেজ পত্রিকা'—২০০০ প্রকাশও করছে। তবে এও ঠিক আরো বেশ কিছু কর্মসূচী সংসদের চিন্তাভাবনায় ছিল য়া রূপায়িত করা যায়নি কখনো পরীক্ষা চলায় আবার কখনো গ্রীষ্ম কিংবা পূজাবকাশের অন্তরায়ে। তবুও সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে যেটুকু কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছে এবং যেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং আশা রাখছি আগামী দিনেও ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

এবারের শারদোৎসব কার্যত অনেকাংশে মলিন। আপাত ঝাঁ-চকচকে তকমায় মুড়লেও ঢাকা যাচ্ছে না বানভাসী মানুষের অসহায় মুখগুলো, চোখ সরানো যাচ্ছে না বন্ধ বা বন্ধের মুখে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার কর্মীদের শুকনো মুখগুলো থেকে। এরই সমান্তরালে বাংলার সমন্বয়ী, চিরায়ত ঐতিহ্যকে ভাঙার হীন চক্রান্ত শুরু হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসামাল, বিপর্যস্ত করার জন্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বলপূর্বক বেআইনি অনুপ্রবেশ চলছে। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'। শান্ত রাজ্যকে অশান্ত করতে সংবিধানের এক বিশেষ ধারার অপপ্রয়োগের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। তাই আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আবেদন, শারদাবকাশে উৎসব পালন, অধ্যায়ন সমস্ত কিছুর পাশাপাশি আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনমতেই অশুভ শক্তি করাল নখদন্ত বিস্তার করতে না পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস-তাণ্ডব সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলো শেষপর্যন্ত মরণযন্ত্রণা ভোগ করবে আপনার, আমার দৃঢ় প্রতয়ী সচেতনতার কাছে। আমাদের শান্ত, সংযত থেকে অতীতের মত ইতিহাস গড়তে হবে।

শারদ অভিনন্দন সহ

কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা একটি বিশিষ্ট কর্ম। চেতনার অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ হওয়ার অন্য নাম। এই পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত। এই পত্রিকা প্রকাশনার কাজে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন। যে সমস্ত মানুষজন আন্তরিক ও অক্লান্তভাবে এই পত্রিকার পতাকাকে উপরে তুলে ধরতে সাহায্য করেছেন আমরা তাদের কাছে ঋণী। আমরা বিশ্বাস করি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সঠিক মাত্রা দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে পত্রিকা। পত্রিকার গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য। আগামীদিনে আরও উজ্জ্বল হোক আশুতোষ কলেজ পত্রিকা — এটাই কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়

তোমাদের অভিবাদন বন্ধু —

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
আপসহীন সংগ্রামে ব্রতী
কিউবার প্রতিযোগীরা
সিডনিতে উঠে এসেছে প্রথম দশে
(পদক তালিকার)

তোমাদের রক্তিম অভিনন্দন

সম্পাদক মণ্ডলী

সমাজতন্ত্র অপরাজেয়
বিশ্বজয়ের সেরা পথ

সিডনি অলিম্পিকে তৃতীয় শক্তি হিসেবে
আত্ম প্রকাশ করবার জন্য
চীনের প্রতিযোগীদের
রক্তিম অভিনন্দন

সম্পাদক মণ্ডলী

জোট বাঁধো তৈরি হও

সাথী,

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা আমাদের মুখ। রোজ যে চেনা-অচেনা মুখগুলো কলেজ ক্যাম্পাসে, ক্যান্টিনে, কমনরুমে, মিছিলে আর সেমিনার-এর নিভৃত নিজস্ব কোণে দেখা যায় সেই মুখগুলো আর একটু সাজানো গোছানো। পালিশ করা ছবি। এই কলেজ, তার পত্রিকা বুকে আলোড়ন তোলে। সেই ১৯৯৬ সাল থেকে দেখে আসা কত কিছু—চলে গেছে তবু যায়নি। কোথাও কোনোখানে থেকে গেছে। আর থেকে গেছে বলে আজও এই কলেজ অনন্য অনুভূতির অন্য নাম। এই পত্রিকার জন্য হাঁটতে হাঁটতে আমরা ধরতে চেয়েছি সবার কথা। কলেজের বুকে ছাত্র সংসদ আয়োজিত নানান অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ অথবা কলেজের অধ্যক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়া বহিরাগত সমাজবিরোধীদের প্রতিরোধ—এ সমস্ত সুস্থ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অঙ্গ। এ সময় বড় কঠিন, স্বাধীনতার ৫০-এর কিছু বেশী বছর আমাদেরকে আবার ঠেলে দিচ্ছে পরাধীনাতর দিকে — এ পৃথিবীর স্বঘোষিত দাদা নগ্ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা মানতে আমরা আজকের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবরা তৈরি নই। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রথম রক্তিম সোপান ১লা মে— ঐতিহাসিক মে দিবস ছাত্র-যুব-কৃষক, শ্রমিকের সাথে হাত মিলিয়ে কোনো বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে নয় ওই ১লা মে-তেই শপথ নেবে নতুন বিশ্ব গড়বার— পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দর্শনে অটুট আস্থা রেখে আমরা একদিন যাবই 'সবাই রাজার দেশে'। দেশের মানুষ খেতে না পান কোনো ক্ষতি নেই, দুঃখ নেই, মার্কিন প্রভুকে বিলাসবহুল ভ্রমণব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবেই। দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের একের পর এক রাজ্যে তৈরি হয় জাম্বো মন্ত্রিসভা—আরে বাবা সরকারটাকে তো রাখতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রকে এরা আক্রমণ করেছে সমানভাবে। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে গুঁড়িয়ে দিতে এরা ডাক দিচ্ছে দেশজুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী বন্দনার — সংসদদের বুকে নিয়ে আসছে — বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিলের মত ভয়ঙ্কর বিল— এই বিল বলছে ব্যাঙ্কে দশ কোটি টাকা থাকলেই যে কেউ দেশের কোনও প্রান্তে খুলতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়। অবাধে দিতে পারবে স্বীকৃতি (অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা)। যথেচ্ছ টাকায় কেনা যাবে ডিগ্রি। শিক্ষার ভুবনায়নের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাই বন্ধু এ সময় লড়াইয়ের। আমাদের লড়তে হবে তাদেরই বিরুদ্ধে যারা মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করে, খেলার মাঠেই পিচ খোঁড়ে, শিল্পীকে গান গাইতে দেয় না, লাইব্রেরীর বই পোড়ায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের উপর চড়াও হয় — তাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সুদৃঢ় করতে তৈরি হতে হবে সব জায়গায়। এ দেশে যাতে শিক্ষাটা শুধু কানোরিয়া কাজোরিয়ার না হতে পারে তার জন্য জোট বাঁধতে হবে। তাইতো সাথী আমরা বলতে চাই—

গ্রাম নগর মাঠ পাথার
বন্দরে জোট বাধো তৈরি হও।
ক্ষেতে কিষাণ কলে মজুর
ছাত্র যুব নওজওয়ান.
সবাই মিলে জোট বাধো
জোট বাধো তৈরি হও।

অভিনন্দন সহ

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ সভাপতি

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

হৈ-হুল্লোড়

দেবাশীষ সোম
প্রথম বর্ষ, বি.এ. (সাধারণ)

দেখিয়ে দেখিয়ে
ওরা হাসে
খিলখিলিয়ে

আমি ওদের প্রত্যেককে চিনি
বহুদিন ধরে জানি
ওদের দুর্বল শরীরগুলি।
কিন্তু কোনদিনও দেখিনি ওদের হাসতে
এত কাছে একদম আমার কানের সামনে।

তুমি নদী

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
ইংরেজি (সাম্মানিক)—তৃতীয় বর্ষ

আমি ছুঁতে চেয়েছি তোমাকে,
ছুঁতে চেয়েছি এক অদম্যতা,
এক অসামান্য প্রত্যয়।
আমি পুড়তে চেয়েছি তোমার অনির্বাণ দীপশিখায়
ভস্ম নয়, আমি অবিনশ্বর....হতে চাই।

আমি অবগাহন করেছি তোমাতে
বুকে নিয়েছি সাত সমুদ্র আর তেরো নদীর জল,
গঙ্গা যমুনা বা ধানসিঁড়ি নয়
আমি জন্মমৃত্যু খুঁজব তোমার তীরে।।

গুহায়

দেবাশীষ সোম
প্রথম বর্ষ, বি.এ. (সাধারণ)

আমায় জাগিও না
আমায় জাগিও না
আমাকে জাগানোর আজ সব পথ বন্ধ।
বিলীন আমি, অন্ধকার গুহায়
গুহার মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় ঠাণ্ডা নদীরা
নদীদের স্রোতে ভেসে ভেসে নীচে নামে
অসংখ্য ঘুমন্ত মানব শিশু,
ভাসতে ভাসতে
তারা বড় হয়...
আরোও বড় হয়...

আমাকে সেখানে ভাসতে দাও,
আমায় জাগিও না ।
আমাকে জাগানোর আজ সব পথ বন্ধ।

বেঁচে আছি

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
ইংরেজি (সাম্মানিক)—তৃতীয় বর্ষ

ওই অজানা অচেনা ঘোড়সওয়ার
চলে গেছে ধূলো উড়িয়ে
তেপান্তরের নিষিদ্ধ সীমানা করে পার
তোমারই ভালবাসা বুকে করে।
হে বন্ধু
তোমার চেতনার সুতীব্র অনুভব
আর, ওই বল্গাহীন ঘোড়ার স্পন্দন
বাঁচিয়ে রেখেছ এই.....
স্তব্ধতা।।

সেই কথাখানি

সৌম্য দাস
ইতিহাস (সাম্মানিক)—দ্বিতীয় বর্ষ

ঐ যে দূরের আকাশটা দেখছো
দেখ, ও কেমন স্নিগ্ধ চেয়ে আছে
এক স্বপ্নে আঁকা রামধনুও
ছড়িয়ে দিয়েছে এই শুকনো মরুদ্যানে।
তবে তুমি যদি একবার বল
'সেই কথাখানি'
এই শুকনো মরুদ্যানেও আমি ফোটাতে পারি
বিকেলের লাল গোলাপ বা রাতের রজনীগন্ধা।
তুমি যদি একবার বল
'সেই কথাখানি'
যে কথা শুনলে পরে
আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায় শিউলির গন্ধ
আর মনে জেগে ওঠে বসন্তের রঙ্গীন স্বপ্ন।
তুমি যদি একবার বল
'সেই কথাখানি'
আমার নীরব মনোবীণায় বেজে উঠত সুরের ছন্দ
তার তালে তালে প্রাণপাখী গেয়ে যেত তার গান।

তুমি যদি একবার বল
'সেই কথাখানি'
যে কথা শুনলে পরে
কবির কবিতাখানি লেখা সার্থক হয়
তুলি দিয়ে আঁকা ছবি যেন বাস্তব হয়।

কি এখনও বোঝনিতো?
তবে থাক, সংগোপনে বলে দিও পরে
আমি কিন্তু অপেক্ষা করে থাকব
শুনব বলে 'সেই কথা খানি'
তোমার গুণ 'সেই কথা খানি'

হত্যা প্রসঙ্গে

পার্থিব বসু
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

একটা ছিল কথা—
বলিনি।
একটা ছিল আকাশ
মধুবনীর মেঘ সাজানো—
দেখিনি।
একযে ছিল শুদ্ধ ইমন তান
শোনাতে চেয়ে ভূ পল্লবে ছিলও সঠিক বাঁক—
অবাক শুনিনি।

সাগর পাহাড়
অরণ্য ঝড়;
হাঁটতে হাঁটতে
এই শহরে,
পথের মাঝে
বিশাল ব্যদান নিখাগী এক গুহা।

আঁধার বাদুড়
মাকড়শা জাল
গলিত পদে একোন রাখাল!
দেখতে দেখতে
চোখ ভরে জল,
ভাবতে ভাবতে
উঠাও আকাশ—

এই ভয়ানক
বলিই তোমায় যদি
শুনবে।

'প্রতিশ্রুতি'

কৌশিক চক্রবর্তী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সাম্মানিক)—প্রথম বর্ষ

বায়ুর স্পর্শে মাতোয়ারা প্রাণ, অবিশ্রাম বৃষ্টির জলে স্নাত
সেই ছোট্ট কুঁড়ি।
গভীর প্রাণস্পন্দন আর প্রবল আত্মবিশ্বাস—
সমুদ্রের গভীরতার থেকেও আরও বেশী গভীর।
বাংলার মাঠ ঘাট নদীতীরে জমে ওঠা সৃষ্টির অবিচল
জীবনরহস্য,
ম্লান প্রকৃতি প্রত্যক্ষ পরাধীনতার দাস—
আকাশ দিগন্তের অভ্যুত্থান মন্ত্র।
তবু মনে হয় সেই ছোট্ট কুঁড়ির কথা, যার বুকে
প্রাণের সঞ্চার
মনে বেচে থাকার ইচ্ছা।
শরতের আকাশের মেঘমালার তীক্ষ্ণ
দুলে ওঠে তার নরম কচি শরীর
যেন কোনো অজানা আলিঙ্গনে
হঠাৎ কেঁপে ওঠা তরুণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—
তারই মত স্বতঃস্ফূর্ত সেই ছোট্ট কুঁড়িটি,
মনে প্রকৃতির ভাবনা—
এঁকে দেয় ভোরের হাওয়ার সাথে কল্পতরুবিন্যাস।
কোনো এক সকালে আশ্চর্য এক অনুভূতিতে মেতে ওঠে
তার পাপড়ি
ছটফটিয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় প্রাণলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে।
কিন্তু সময়ের আলিঙ্গনে বাধা পড়ে সে
দীর্ঘকালের স্বপ্নসুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন—
জীবনরস সৃষ্টির এতটুকু অধিকার নেই ছোট্ট কুঁড়ির
কিন্তু বাঁচার অধিকার আছে। তাইতো সৃষ্টির প্রবল আনন্দে
মেতে উঠে শীতের শুষ্ক হাওয়ায় একটু একটু করে
দোলাতে থাকে তার শরীর—
মাটির টানে, নতুন কিছু পাওয়ার টানে।
যেমন করে কোনো নতুন সভ্যতার উত্থান পতন
তেমনি অবিচল নিস্পন্দ স্পন্দনে ভবিষ্যতে মাথা তুলে
দাঁড়াবার স্বপ্ন সেই ছোট্ট কুঁড়ির।
চারিদিকে প্রবল প্রতিযোগিতা, বিপ্লব, দ্বন্দ্ব—হোক না
প্রকৃতির প্রবল আত্মহুংকারে কম্পিত নয় তার ছোট্ট শরীর।
তবুও শুধু ভাবনা নয় মনে আছে ভয়।
হয়তো বা দুষ্ট কোনো প্রকৃতিপ্রেমী
দুমড়ে মুটড়ে তার দেহের সৌন্দর্য্য আহরণে হবে
উন্মত্ত উৎসাহী।
কিন্তু জীবনের শেষ আলোটুকু নিভে যাওয়ার আগে
সে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে চায়,
'আমি ছোট্ট কুঁড়ি, দুর্বার দুর্জয় আমার পথচলা
যার অন্ত নেই।'
প্রকৃতির বুকে সে সৌন্দর্য্যের স্থির প্রতিমূর্তি
যা শোনাবে ভবিষ্যতের গল্পকথা, দেখাবে এগিয়ে
চলার পথ,
গাইবে জীবনের জয়গান, বলবে—
শুনছ তোমরা, সভ্য জগতের অসভ্য বাসিন্দারা
হ্যাঁ তোমাদেরই বলছি আমার মৃত্যু নেই...
তার শেষ প্রতিশ্রুতি।।

অব্যক্ত প্রেম

শুভঙ্কর কর
বাংলা (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

সেদিন সন্ধ্যায় যখন এসপ্ল্যানেড থেকে ফিরছিলাম—
তখন SD-4-এর জানালায় দেখেছিলাম,
তোমার উড়ন্ত চুল।
তোমার চুলের স্নিগ্ধ সুবাসেই মনে পড়েছিল
তোমার কথা;
মনে হয়েছিল—
অতীত যেন অঞ্চল ভ'রে, আমায়
সমস্ত স্মৃতি ফিরিয়ে দিল।
মনে পড়েছিল, সেই গাছটার কথা—
যেখানে তোমার নাম খোদাই
করেছিলাম আমি।
মনে পড়েছিল, যখন বাসন্তীর মেলায়—
ভীড়ের মধ্যে দুজন হারিয়ে গিয়েছিলাম;
সেদিনি প্রথম আমি বিরহের মানে বুঝেছিলাম।
কিন্তু, আজও কি সেই অব্যক্ত প্রেম
—তুমি বোঝ 'নি?
শুনতে পাওনি বিরহ ব্যাথার
—সেই অস্ফুট ধ্বনি?

নিছক দর্শক

মহম্মদ আবুসাব রহমান
বি.এস.সি. (সাধারণ) — প্রথম বর্ষ

তোমার তৃষ্ণা দেখে,
আমি চেয়েছিলাম তৃষ্ণা মেটাতে,
কিন্তু তার আগেই তুমি—
আকণ্ঠ পান করে মাতাল হয়েছো,
সে কথা আমি টের পাইনি একবারও।।
তোমার মন না বুঝে,
আমি তোমাকে দিয়েছিলাম মন,
কিন্তু তার আগেই তুমি—
অপরের উত্তাল মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে,
স্নান সেরেছো প্রেমের সাগরে,
সে কথা আমি টের পাইনি একবারও।।
তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে,
আমি তোমাকে চেয়েছিলাম ভালবাসতে,
কিন্তু তার আগেই তুমি
কলঙ্ক মেখে কলঙ্কিত করেছো তোমার জীবন
সে কথা আমি টের পাইনি একবারও।।
তাই তোমার জন্য উজাড় করা মন,
প্রেমভালবাসা সাঙ্গ করে
আজ আমি নিছক দর্শক।।

ধূসর বসন্ত

দেবাশীষ মণ্ডল
গণিত (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

তুমি এসেছিলে আমার জীবনে
এসেছিল একবার।
রক্তিম পলাশের স্পর্শে সেদিন
আমার হৃদয়ে জেগেছিল বসন্ত।
কিন্তু কোকিলের কুহুতান
শোনা হয়নি আমার।
কালবৈশাখীর রণোন্মত্ততা
ছিন্ন করে দিয়েছে জীবনের সুর।
আজও আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে মরি
আমার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা—
যেখানে শুধু তুমি ছিলে, ছিলনা কোন ব্যস্ততা,
যেখানে শুধু তুমি ছিলে, ছিলনা কোন হিংস্রতা,
যেখানে শুধু তুমি ছিলে, ছিলনা কোন বিরোধিতা।
তোমার সেই অনন্ত ভালোবাসা
আমার জীবনে এনেছিলে আলোর দিশা।
তাই নিস্তব্ধ অন্ধকার শূন্য ঘরে
আজও আমি বলে উঠি—
তুমি এসেছিলে আমার জীবনে
এসেছিলে একবার।

অপেক্ষা

লক্ষ্মী নস্কর
বি.এ. (সাধারণ) — প্রথম বর্ষ

জান অনুপম আমি সেদিনও
তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।
যে দিনটি ছিল তোমার আমার
দুজনের জীবনেই অতি স্মরণীয়।
সেদিনও আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
আমাদের সেই পুরানো শিমূলের তলায়।
কিন্তু আগের মত একটা শিমূলের তলায়।
ছিলনা গাছের শাখায়।
অপ্রত্যাশিত একটা দক্ষিণা হাওয়ার
দাপটে ঝরে যাচ্ছিল—
অদূরে তেঁতুল পাতাগুলো তিরতির করে,
যেন নতুনের আগমণে সুযোগ করে দিয়ে
নিজে স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছে।
হঠাৎ একটা কালো মেঘ এসে
ঢেকে দিল সূর্যটাকে। প্রকৃতিটা
আরো কালো করে দিল, একটা
কয়লার ইঞ্জিন হু হু করে ছুটে গিয়ে।
আমার চোখে অমাবস্যার আঁধার।
এনে দিল সৌগত।
বললে "শ্রেয়া তুমি ফিরে যাও।
অনুপম আর কোন দিন তোমার কাছে আসবে না।
জাননা? ওর বিয়ে আজ সন্ধ্যায়।"
কথাটা বলেই ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল সে।
আমি নিশ্চল! তারপর ভাবলাম,
ছুটে যাব, চিৎকার করে বলবো অনুপম আমার,
ওকে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কারো নেই।
পরে ভাবলাম অনুপমতো সুখী হয়েছে, তবে
আমি কে? ওর সুখেই তো আমি সুখী।
কেন না, আমি যে ওকে সত্যি সত্যি ভালবেসেছি।
তেঁতুল পাতার মত আমিও ঝরে গেলাম।।

আমি একটা ক্যাকটাস

শ্রাবন্তী পাল
সমাজতত্ত্ব (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

আমি একটা ক্যাকটাস
আর তুমি সুন্দরী গোলাপ,
তোমার জীবন সুন্দর, পবিত্র, নিষ্কলুষ,
আমি ঘৃণ্য, নগন্য।
আমি ঝড়, জল, তাপে স্থির থাকি।
তুমি থাকো বেড়ার ওপারে,
ভালো মাটিতে , সারে জলে তোমার পুষ্টি।
আমাদের মাঝে আছে একটা বেড়া।
তবু যদি এই বিশ্রী গাছটার বন্ধু হতে চাও,
আমি চিরকালই বাড়াব আমার
কাঁটার হাত।
আর যদি বিদ্ধ হবার ভয়ে সরে যাও,
বুঝব এ বন্ধুত্ব অসম্ভব।।

রাতের শব্দে

অরিত্র চট্টোপাধ্যায়
পদার্থবিদ্যা (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

শুধু রাতের শব্দ শুনব বলে দাঁড়িয়ে থাকা,
কানাগলির শেষপ্রান্তে।
রাতের শব্দ, পূর্ণিমা চাঁদ আর ঝিঁঝিঁপোকা,
ডাকছে কোনো অতীতে।

বলছে যেন—ইতিহাস, আজ,
শুনছ মানুষ?

রাতের শব্দ শোনার আশায় দাঁড়িয়ে আছি,
—ইতিহাসের কাছাকাছি।

এক শিশুর প্রতি

সন্দীপ দে
গণিত (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

এই মাত্র জন্ম নিল একটি শিশু
বলছি শিশু, কিন্তু সে বিজ্ঞ তোমার আমার সকলের চেয়ে,
দু'চোখ বন্ধ করে থাকে, দেখতে চায় না সমাজ কে,
দু'হাত তুলে কাঁদে, ফেলে দেয় দুধের বাটি...
নিতে চায় না ঔপঢৌকন।

আমি দেখি, ভাবি, তবে কী আমরা কাপুরুষ?
নিঃশব্দে অন্যায় হতে দেখি, আর চুপ করে থাকি
যদি চাকরি চলে যায়; বা যদি হয়ে ক্ষতি।
আরও পাঁচটি বছর যায়।
শিশুটি ক্রমে বড় হয়, শিক্ষা নিতে শুরু করে।
ছোট্ট মস্তিষ্কে যেন তথাকথিত জ্ঞানের মন্ত্র।
জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে ক্রমে পেরোয় স্কুল কলেজেরক গণ্ডি।
প্রবেশ করে কর্ম জীবন,
এখন নেই তার মুষ্টিবদ্ধ হাত; নেই কোনো প্রতিবাদ।
এখন সে জ্ঞানী,
সে আজ ধনী,
আমি হাসি, এও তাহলে কাপুরুষ।

চোখ বন্ধ করি, মনে মনে বলি...হায় ঈশ্বর।
ভূমিষ্ঠ করো আরও কটি শিশু।
কিন্তু তারা যেন বড় না হয়।
কেউ তো থাকুক, হোক না নগ্ন।
তবুও দারুণ কান্নায়, উন্নত হাতে,
সুতীব্র ধিক্কার জানাক এ সমাজকে।

জীবন-মৃত্যু

অনির্বাণ রায়
বি.এস.সি (সাধারণ) — তৃতীয় বর্ষ

এই সৃষ্টি ছাড়া পৃথিবী থেকে আমি চলে যাবো—
অনেক অনেক দূরে;
হৃদয়ে দুঃখ আর বেদনা নিয়ে বিদায় নেবো,
জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এ এক স্বার্থপরের পৃথিবী, নেই ভালোবাসা
অর্থই মানুষকে করেছে স্বার্থপর।
এই দুনিয়ায় পথ চলতে গেলে অর্থই প্রধান ভরসা,
সে বিষয়ে আজিকের মানুষ হয়েছে তৎপর।

জীবনের চলার পথে হয়ে ওঠে কণ্টকময়,
সেই কণ্টক, বিদীর্ণ করে পথিকের পদতল।
ক্রমশ সেই পথ হয়ে ওঠে রক্তময়,—
তবু এগিয়ে চলে শ্রান্ত পথিকের দল।

এ এক অন্ধ প্রতিযোগীতার সময়—
কেউ হারে, আবার কেউ বা জেতে;
কিন্তু জীবন সায়াহ্নে চলে যেতে হয়,—
জীবনের শেষ হিসাব মেলাতে।

আমি চলে যেতে চাই বহু দূরে,
যেখানে আছে পরম শান্তি।
কিন্তু, এই সুন্দর ভূবনকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করে,—
হৃদয়ে জেগে ওঠে অশান্তি।

মৃতেরা কোথায় যায়? জানতে বড় ইচ্ছা হয়,
মৃতেরা তো আর ফেরে না?
তাই প্রশ্ন রয়,
মেটে না সেই অতৃপ্ত বাসনা।

"কবি সুকান্ত স্মরণে"

অনন্য ভট্টাচার্য্য
উদ্ভিদবিদ্যা (সাম্মানিক)— তৃতীয় বর্ষ

বিপ্লবী, কবি সংগ্রামী কবি
মাতৃভূমির স্বাধীনতা কামী
শ্রমিকের কবি, শোষিতের কবি
ছিলে গরিবের অন্তর্যামী ।
অনাথের কবি, চেতনার কবি
মজুরের কবি তুমি
ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেলে
কাঁদিয়ে জন্মভূমি।
নতুনের কবি, বারুদের কবি
স্বপ্নের কবি তুমি
লক্ষ কোটি মন কাঁদে সারাখন
আজও তোমাসবে নমি।
ছিলে প্রভাতের রবি
পূর্ণিমা রাতে চাঁদ
ছিলে তারকার ঝিকিমিকি
ছিলে অনাথের নাথ।
স্বাধীন ভারত, স্বাধীন মানুষ
এ মন্ত্র যার ছিল
নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে এনে
অকালে সেই যে গেল।
মুক্তির স্বাদে বঞ্চিত হলে
অল্পেই হলে ক্ষান্ত
বাংলার বুকে নবজাগরণ
চলে গেলে, কবি সুকান্ত।

তীর্থব্রত

অমল চক্রবর্তী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এইমাত্র ভোর হ'লো নীল সুইচ টেপা হয়ে গেছে
এবার লালটা টেপো ব'য়ে যাবে ভোরের বাতাস
হলুদে আলতো আঙুলে রোবো আসবে বেড-টি সাজিয়ে
ইচ্ছে হ'লে কালো টেপো টুথব্রাশ মেজে দেবে দাঁত
তোমার চারপাশ উপচে আমার চারপাশ উপচে সুইচ
অসংখ্য অনন্ত সুইচে ভোরের বাথরুম থেকে রাতে
বিছানায় যা যা করা সকলি তো রিমোট কন্ট্রোলে
হাসি দুঃখ স্বপ্ন ঘুম শোয়ার ক্ষমতা বমি চুমো
সন্তানের জন্য প্রেম নিজের রক্তের স্বেচ্ছাচার
সুইচে সুইচে ঘুরে যায় দেশ থেকে দেশপ্রেম সব

বহু বহু দিবসের বহু বহু ব্যাপ্ত বলিদানে
এই হাইটেক তীর্থ আজ পেয়ে হাতের মুঠোয়
তোমার আমার মধ্যে স্তরে স্তরে মৃত পরম্পরা
সাজিয়ে সংসার করি গর্তে গর্তে মেট্রোপলিটনে।

বন্যা প্রসঙ্গে

সজল বসাক
বি.এস.সি. (সাধারণ) — তৃতীয় বর্ষ

বন্যা বিধ্বস্ত আমার মা
চারিদিকে শুধু হাহাকার
হা-অন্ন হা-অন্ন
কেঁদে ওঠে মাতৃ হৃদয়
নবজাতককে কি শোনাবে—
আজ আশার বাণী
কি গাইবে গান
যার জন্ম গাছে
সে যদি হৃদয় ছিঁড়ে বিদ্রোহ করে
কি শোনাবে—গান না কলতান?
হাজার কোটির প্রাণের করুণ আর্তি—
হাজার প্রাণে ধ্বনিত হোক
এ প্রকৃতির বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ।

শোকগাথা

অমল চক্রবর্তী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আমার স্মৃতির বিছানায় তোমরা দু'জনে শুয়ে আছো
যাবার আগে যে যন্ত্রনা দিয়েছ আমাকে
সেজন্য কোনো রাগ নেই আমার
আমি ভাবছি, এতোদিন যে সাথে সাথে ছিল
আমার দুঃখে ও আনন্দে
আজ অন্য আরেকজনের হাতের ছোঁয়ায়
আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন

তোমাদের সততা ও পরিশ্রম
মায়ায় জড়িয়ে রেখেছিল আমাকে
তোমাদের বিচ্ছেদ সেই মায়া বাড়িয়ে দিয়েছে আরো

তাহলে বিচ্ছেদেরই জয় হোক

তোমরা এসো আমার ঘুমের মধ্যে
তোমাদের শূন্যতার মাঝখানে
বিরহের শোক গাথা হ'য়ে
অমার দুখানি দাঁত, এসো।

শোকগাথা-র ইংরাজী অনুবাদ

An Elegy

রমেন্দ্রনাথ দত্ত
অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

You two now lie on my memory's bed
I harbour no anger to you
Before you left me for good
You cost me many a tea, though
I ponder you stood by me so long
In weal and woe, intimately, endearingly
Why didn't thou forsake me
At the more touch of the other one's
fingers.

You diligence and integrity,
Embraced me so long in a strong corl of
love and affettion
Your seperation only hath intensified it.
Then let this alienation thrive.
Come to me in my sleep
In then vold this made by your departure
Let you come as a dirge
Oh my twin teeth, I invoke thee.

বিনিময়ে....

সম্রাট সেনগুপ্ত
ইংরাজি (সাম্মানিক), প্রথম বর্ষ

প্রতিভোরে সূর্যের রক্তে
আকাশের মুখ দেখা মেঘের আয়নায়
শুধুই স্বপ্নময়।
আজ কেবলই দূষিত ধূসর বিজ্ঞাপনী মোহ—
রূপালি অন্ধকূপে কলগেট সুন্দরী।
যন্ত্রগণকের ঢেউ-এ পণ্যের হাতছানি।
সস্তায় পুরানো মনের বদলে নতুন হৃদয়,—
জঞ্জালে জ্বালানির সন্ধান,—
লোভের সাথে অমানবিকতা বিনামূল্যে।
চ্যানেলে চ্যানেলে ধর্মীয় বিলাসিতা—
রহিমের কার্যফলকে রামের ছিন্নমুণ্ড,
জ্বলে খ্রীষ্টান হিন্দুর বানানো জতুগৃহে।
অবিশ্বাসের আকাশে আজ
ভাসে প্রেয়সীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।
জ্বলন্ত সময়ে অগ্নি পিপাসু আমি—
পীড়ের দরগা থেকে ওয়েবসাইটের রোশনাই;
রাজার কনভয় থেকে চায়ের দোকানে,—
ভ্রমেছি দিকে দিকে একমুঠো আগুনের খোঁজে।
নিলাম ওঠা মগজের মায়াবি ঝংকারে
শত শত হৃদয়ের ওঠানামা,
নিয়ন্ত্রিত শাসন—স্বপ্নের ভুলভুলাইয়া।
আগুনের অতৃপ্ত স্বপ্ন বুকে নিয়ে
বিজ্ঞাপনী তারস্বরে আমার এ ডাক
পণ্য লোভী রক্তমাখা ওদের,—
এক ভুবন স্বপ্ন বেচবো,
একমুঠো আগুনের বিনিময়ে,
বিনামূল্যে গ্লানিহীন বেঁচে থাকা।

এখানে নেই

রূপা বর্দ্ধন, বি.এ. ১ম বর্ষ

এখানে অনেক বিদ্রোহ জমে আছে,
জমে অছে হাজার মানুষের কান্না
তুমি এখানে তোমার খুশির লহরী এনো না।

তোমাকে ফিরিয়ে দেবে
হাজার মনুষের হৃদয়ের ক্ষোভ
ভিতর থেকে উথলে ওঠা কান্না।

তুমি ফিরে যাও কবি
এখানে শান্তি নেই
আছে শুধু রক্তের হোলি খেলা
এর মাঝে বসে কেমন করে
লিখবে তুমি কবিতা।

কল্পনার সমুদ্র এখানে
দরিদ্র মানুষের-রক্তে লাল
খুশির সাম্রাজ্য এখানে
নিরন্নের অন্নের হাহাকারে পরিণত
বদলে গেছে মানবতা মানসিকতা

অনাহারী মানুষের কাছে
কোন্ অধিকারে
মুখের হাসি চোখের খুলি
আশা করো তুমি ?

ফিরে যাও কবি
এ জনঅরণ্য থেকে
কোন নির্জন পাহাড়ের গভীর প্রতীক্ষায় ।।

জীবন-যুদ্ধ

কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়
প্রাণিবিদ্যা (সাম্মানিক), দ্বিতীয় বর্ষ

জীবন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেই হবে পাড়ি
লক্ষ্য সুদূর তবুও হোক সংকল্প কঠিন ভারী
অকূল পাথার, পার হওয়াটা সহজ কথা নয়
মনে যদি ভরসা থাকে কিসের তবে ভয় ?

নীচে নামা অনেক সহজ ওপরে ওঠার চেয়ে
তাই বলে পিছিয়ে আসিসনাকো কষ্টতে ভয় পেয়ে
কষ্ট দিয়েই সাফল্য জয় করতে হয়
জীবনযুদ্ধে সফল হলে সবই আলোকময়।

হারাজেতা আসবে ঠিকই একের পরে এক
হারার থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার চেষ্টা করে দেখ
অন্ধকারে সারা জীবন থাকে না কভু ঢেকে
আঁধার কাটলে সূর্য উকি মারে আকাশ থেকে

বসে থাকলে হবে না যে লড়তে তোকে হবে
চেষ্টা না করে সফল কে হয়েছে কবে
তাইতো বলি মনকে এবার শক্ত করা চাই
মনের জোরের কোনরকম বিকল্প যে নাই।।

Flying Dream

জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র
বি. এস. সি. — ১ম বর্ষ

Pent in the room
I, fly, with the clouds
Fleshing lights, thundering gale
Accelerates me.
Above the grasses & the crops
I glide with the breeze
Distant destination, known goal
I fly up, to catch my dreams
Sun sift, moon appear.
Huner light envelops the sky
I fly & fly, feels tired
But, the dreams fly forever
Awaken, I am still here.

A Special Friend

সুচন্দ্রা সিনহা রায়
বি. এ. — ১ম বর্ষ

A Special friend is someone
Who will always mean so much,
Someone who will always care
and always keep in touch
A special friend is almost like
a sister or a brother,
For there are things that you can only
tell to one another
A special friend
can help you through
your very hardest days
On brighten up the good times
With their caring, thoughtful ways.
That's why of all the many joys
that like could ever send
There is no greater treasure
than a very special friend.

Life should be a Beautiful Dream

ক্ষুদিরাম মল্লিক
বি. এ. (সাধারণ)— দ্বিতীয় বর্ষ

When I everfeel bored
with the struggles and strains of this life,
Mu mind flies into the dreams,
of wonderful life.
To think of being mounted on a horse
Alone over the Sahara,
or in a cave alone in the forest
of the darkest ever— Africa,
or in a shuttle that zooms above
To search life in some other world,
of toreach the sky over the foramy waves
By which the shores are often perled.
of in a mountain blizzard
Spikes in Shoe, Ice-axe in hand,
For ests, deserts, oceans, space
Everywhere in unknown land.
Life time should be a dream,
Going on through the cold and heat
In search of the unknown, death doesn't care
To mark the victory of the human Spirit.

Tonight

শুভম মুখোপাধ্যায়
বি. এস. সি. (সাধারণ)— প্রথম বর্ষ

Tonight I can write,
when there is no moon in the sky.
When my hopes to win your love—
begin to die.
Tonight I can write,
when there is no excitement in life;
have wept a lot,
but it's of no use,
I feel defeated.
I have promised myself,
not to bother you with my unworthy love
because it does not have the precious
wings of the dore
to reach the horizen.
I feel depressed.
Tonight I can give all my belongings to a person;
who can give me the answer to one question—
why do I love you so much?
I'm waiting for that person.
Tonight I can assure you that
I woun't put my feelings'
Between you, your love and your likings;
I just wish you are always happy.

NEMO

দেবাশীষ দেব
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সাম্মানিক) — তৃতীয় বর্ষ

I met a boy that was as funny as a clown.
He ruled the world and Asutosh ans prob ably the whole town.
I will tell his name only when he is gone,
Though he ruled the West-Insides, prob ably the whole Santoshpur town..
He had friends that lasted less than a year,
But, he was was famous for his logo, which probably was too dear.
Then one day, he fell in love when the stakes were too high
Alas! those naughty friends made it a scandal as she bid bye-bye.
He kept on roaming, dreaming, till when he is in death-bed.
Now, I'will tell his name— NEMO, my best clown friend.

Who is The Loser

জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র
বি. এস. সি. (সাধারণ)— প্রথম বর্ষ

The brightness of the rising Sun,
Green plains and the sky.
The blue sky with silver clouds,
The pure dews & impure rain.
Smoky horizon Y dusty ways.
Thundering sky wife firshing light.
The violent gale and the swut msell,
The shower of derd leaves, throught the ways.
The casualities & the destruction,
The lonely bitter cry.
The day starts, it ends
With the percetible elements
Centures pass, enrron ment changes.
"Who is the loser?"
The progress, or, the Nature.

ফুল ফোটার গল্প

অমিত কংসবণিক
বি. এ. (সাধারণ) — দ্বিতীয় বর্ষ

ভোর হয়। সূর্য ওঠে। স্বপ্নের আলোর ঝলক নিয়ে ফুটে ওঠে রোদ্দুর। গাছের পাতায় পাতায় পাখির নতুন ভোরের গল্প। বাগানের মালিটা ফুল ফোটায়। একের পর একেকটা ছবি।

নাম তার বনমালী। এমন সার্থক নাম কে রেখেছিল সে জানে না। অনেক কিছুই সে জানে না। কেমন করে সময় বয়ে যায়, সবুজ স্বপ্ন মরে মরে হয়ে যায় বিবর্ণ ফ্যাকাসে। জন্মদুখী ভিখারী অভিশাপ দেয়— কিছুই জানে না সে। জানার কথাও নয়।

"—ও কাকু, পাঁচটা বাজে। পড়াতে বসবে না?" দশ বছরের ছেলে অমল এসে ডাকে বনমালীকে ।

—হ্যাঁ, পড়াব। পড়াব। তোরা যা-আমি আসছি।

— তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে? অমল বলল। বনমালী আকাশের দিকে তাকাল অন্যরকম বটে ।কে ভেবেছিল সেদিনের ছোট্ট বালাক আজ বাগানের মালি বনমালী।

সে অনেককাল আগের কথা। হয়তো বহুযুগ। সব ঠিকঠাক মনেও পড়ে না। শুধু মনে পড়ে একটা গ্রাম। ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের একপাশে ছোট্ট কুঁড়েঘর। পাশে ডোবা। ডোবার ধারে শিউলিগাছ। শরতের ভোরে শিউলিঝরা পথ। এই নিয়েই পৃথিবী।

তবু পৃথিবীটা বড় সুখের নয়। বাবা ছিল এক তেলের কারখানার কর্মচারী। মাইনে নিয়ে প্রায় বচসা। শেষে লকআউট। বনমালীর বাবা তখন অসহায় বাড়িতে দুবেলা ঝগড়া বনমালীর মায়ের সাথে।

—বলি চারদিন হল তেল ফুরিয়াছে, রান্না করব কি জল দিয়ে?

ক্রুদ্ধ বনমালীর বাবা জবাব দেয়

—এবার থেকে তাই করবে।

—সবই কপাল। নইলে তোমার মত অপদার্থ স্বামী জুটবে কেন? লোকে দেখ দুহাতে পয়সা লুটছে, আর তুমি?

—ওরা ধান্দাবাজ।

মুখ বেঁকিয়ে স্ত্রীর উত্তর "হয়েছে"। ঢের হয়েছে। অনেক আদর্শই তো দেখলাম। আমি মরলে না হয় আদিখ্যেতা কোরো।"

বনমালীর বয়স তখন দশ। বাবা খুব ভালবাসত তাকে। বলত

—যাই করিস খোকা, অসৎপথে যাসনে কোনদিন। মা খেপে উঠত তৎক্ষনাৎ—

'খবরদার বলছি— তোর বাবার বুদ্ধিতে চলবি তো না খেয়ে মরতে হবে।

তবু তো ছিল। না খেয়ে মরব তবু আদর্শকে মারব না— এমন বুদ্ধি। সংসারে যোগাবার মত লোকও তখন বেঁচে ছিল। বনমালী ভাবে। একটা সন্ধ্যা। রক্ত সন্ধ্যা। এমন সন্ধ্যায় কত কিছুই তো হয়— সূর্য ডোবে, তারা ফোটে, প্রেমিকার কাজলটানা চোখে হয়তো বা ফুটে ওঠে ভালবাসার আর্তি। বনমালীর জীবনে ওসব নেই। বনমালীর জীবনের রক্তসন্ধ্যায় বাবা মারা যায় ম্যালেরিয়ায়।

বাবা মরে গিয়েছিল। বনমালী তখন দশবছরের। দুদিন বাদে মা পাগল। মামারা যেতেই দাদা জোর করে বিয়ে দেয় বনমালীকে। দু বছর পর বৌ হাওয়া বনমালী তখন এক চায়ের দোকানে কাজ করে। দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

একঘেঁয়ে জীবনের নোনতা স্বাদ। বৈচিত্র্য নেই, সৌন্দর্য নেই। নিঃসঙ্গ জীবন হাঁফিয়ে ওঠে প্রতি মুহূর্তে। মনে হয় সব মিথ্যা -মায়া-ভ্রম। বিশাল পৃথিবীতে সবাই নিমিত্ত মাত্র।

ঈশ্বরতত্ত্বের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক অনেকদিন খেয়েছিল বনমালী। অনুশ্রী তাঁর জীবনে না এলে যে কি হত। অনুশ্রী। সত্যিই এক অদ্ভুত সৃষ্টি। পঞ্চাশ পার হওয়া জীবনে কত কিছুই তো দেখলো বনমালী! কই! আর একটা অনুশ্রী তো চোখেও পড়ল না। এখনো এমন মেয়ে জন্মায়? মাঝে মাঝে মনে হয় বোধহয় উপন্যাসের চরিত্র।

মেঘমেদুর এক বর্ষার ভোরে প্রথম দেখেছিল অনুশ্রীকে। মুখ তো নয়, যেন ভোরের প্রথম ফোটা ফুল। ভরা দিঘির মত চোখে যুগ যুগান্তের মুক্তির স্বপ্নগঙ্গার স্রোত। অবাক হয়ে চেয়েছিল বনমালী। পরমুহূর্তেই লজ্জা পেয়ে মুখ নামাল নিচে।

সেদিন খুব বর্ষা ছিল। কাজে বের হয়নি বনমালী। রাস্তা দিয়ে বোধহয় যাচ্ছিল মেয়েটি। হঠাৎ বৃষ্টি নামায় বনমালীর বারান্দায় আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করল বনমালী "কিছু মনে করবেন না— আপনি কি এই পাড়ার মেয়ে? মেয়েটি হাসল "না আমার বাড়ি ব্রহ্মপুর। এখানে ঘুরতে এসেছি। একটা ঘর দেখে দিতে পারেন? ভাড়া নেব?"

বনমালী আড়ষ্ট হয়। "বেড়াতে এসে ঘরভাড়া?"

আবার হাসল মেয়েটি "আপনাকে তবে খুলেই বলি। আপনাকে বলা যায়। আসলে এখানে আমি একটা ফ্রি কোচিং আর ডাক্তারখানা খুলব। আমায় একটু সাহায্য করবেন? "আমি একটা সামান্য চাকরি করি তাই দিয়ে হয়ে যাবে।"

প্রথম পরিচয় এমন সাবলীলতা সচরাচর চোখে পড়ে না। বনমালীর বিস্ময় বেড়েই চলে। এ কেমন মেয়ে? শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-সৌন্দর্য সবই আছে, তবু এ কি খেয়াল?

পরিচয় ক্রমে বেড়েই চলে। গাঢ় হয়। একদিন বলে অনুশ্রী

—আচ্ছা, আপনি সবসময় এত মনমরা থাকেন কেন?

—ভাবি।

—কি এত ভাবেন? ভাবলেই মনখারাপ। এই দেখুন না আমি কত ফ্রি।

—আচ্ছা আপনার কথায় একেক সময় হাসতে বড় ইচ্ছা করে।

—কি কথা?

—আপনার অতীত, সংসার, উদ্দেশ্য—

—কেন?

—আপনি কেমন রহস্যময়ী।

খিল খিল করে হেসে উঠল অনুশ্রী "একটু রহস্য থাকা ভালো বনমালীবাবু। আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো? হঠাৎ এত কৌতূহল?"

—আচ্ছা অনুশ্রী, একটা জিনিস ভাবুন তো মানুষের আজকে তো কত সমস্যা, কত সঙ্কট— আপনার মত সবাই যদি ফ্রি-কোচিং আর ডাক্তারখানা খোলে তাহলেই কি সঙ্কট মিটবে?

অনুশ্রী হাসল "আপনি কি সব রোগে একই ওষুধ খান বনমালীবাবু?"

—কেন?

—নইলে সকলেই ফ্রি-কোচিং আর ডাক্তারখানাকেই সমাজমুক্তির পন্থা হিসেবে বেছে নেবে এমন কথা আপনি বলতেন না।

—কিন্তু আপনার রহস্যের কথা আমায় কি জানাবেনই না?

—নাই বা জানালেন। গাছে ফুল যখন ফোটে তখনই তা সুন্দর। সেই সৌন্দর্যের রহস্য খুঁজতে যদি শিকড় টেনে বার করেন তা কি সুন্দর থাকবে?

অনুশ্রী বেশিদিন ছিল না। পাড়ার লোকেরা অনুশ্রীকে জড়িয়ে তাকে কদর্য ইঙ্গিত করেছিল। সে জন্যও বোধহয় নয়। আসলে অনুশ্রীরা বেশিদিন একজায়গায় কোথাও থাকে না। ওরা পৃথিবীর জাহাজ। বন্দরে বন্দরে সত্যকে, কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবন। যাবার সময় বলেছিল অনুশ্রী "আমার কাজ এখানে মিটল। চললাম। ফ্রি কোচিং আর ডাক্তারখানাটা একটু দেখবেন। কেমন? পারবেন তো?"

অনুশ্রী এসেছিল ঝড়ের মত। চলেও গেল ঝড়ের মতই। জীবনটাকে ওলটপালট করে দিয়ে। সৃষ্টির খোঁজে তাই বনমালী আজও নতুনত্ব খোঁজে। সৌন্দর্য খোঁজে। ডাক্তারখানা দেখে। অমলদের পাড়ায়।

ক্রমে আকাশে ভোরের আলোর রক্তিমতা ছড়াতে থাকে। দিন বদলের নতুন বনমালী ফুল ফোটায়, এক-দুই-তিন।

"হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের;
—বিদেশী টহল্‌দারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।
দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউ এর- হিল্লোল,

নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া!"

— প্রেমেন্দ্র মিত্র ।

"মিথ্যে আশ্বাস"

অভিষেক ঘোষ
বি. এ. (সাধারণ) — প্রথম বর্ষ

অনেক কষ্ট করে আজকেও জায়গা পেলাম না মিনি বাসে। চুপ চাপ উঠে কোণের দিকে একটু জায়গা নিয়ে দাড়িঁয়ে ছিলাম। হঠাৎ কানে এলো সেই সুর—

"যেমন শ্রী রাধা কাঁদে শ্যামের অনুরাগী.....
তেমন করে কাঁদি আমি".....

হাতে দু টুকরো ভাঙ্গা চারা নিয়ে সেই ছেলেটা গান করছে।

প্রতিদিন অফিস টাইমে এই মিনি বাসের স্ট্যান্ড থেকে উঠে ছেলেটি গান করতে করতে ডালহৌসি যায় আবার ফিরতি বাসে ফিরে আসে। বয়েস ছেলেটার কম এবং গলাটাও মিষ্টি। সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম হ্যাঁরে! এই গান করে পয়সা নিয়ে কি করিস?

শুনে ছেলেটি করুণ হেসে বলেছিল, দাদা, বাড়িতে এক বিধবা মা আর এক বোন আছে। এই পয়সায় আমাদের তিন জনের ছেট সংসার কিছুতেই চলেনা। তবু মা কোন রকমে টেনে টুনে তিনজনের সংসার চালিয়ে নেয়।

এই রকম কথা বলতে বলতে ও আমার হাতটা ধরে কেঁদে ফেলল আর বলল, দাদাবাবু আপনারা তো রোজ অফিসে যান, আমাকে একটা যে কোন কাজ দিতে পারেন। একটু হেসে বলেছিলাম, ঠিক আছে দেখবো। ও আবার গান গাইতে গাইতে চলে গেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে এবং ভাবতে লাগলাম অনেকের মত আমিও ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিলাম।

এই ভাবেই চলছিল গতানুগতিক জীবন। হঠাৎই আমাদের অফিসে একটা পিয়নের জন্য ছেলে নিচ্ছে, সেই সময় আমি আমার সাহেবকে সব খুলে বললাম, সাহেব সব শুনে বলেছিলেন, আচ্ছা কাল আপনি ছেলেটাকে নিয়ে আসবেন। মনে ভাবতে লাগলাম ভগবানের আশীর্বাদে ছেলেটার কাজটা হয়তো হয়ে যাবে। মনে মনে আমিও খুব খুশি হলাম।

পরদিন সময়ের থেকে একটু আগেই বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেলাম। কদিন ধরেই ছেলেটা আসছিল না, অনেক আশা নিয়ে আমি সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম বাস স্ট্যাণ্ডে, হয়ত আজ ছেলেটাকে দেখতে পাব। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাস স্ট্যাণ্ডের স্টার্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কারো জন্য অপেক্ষা করছেন জয়ন্তদা? আনমনা হয়ে বললাম হ্যাঁ ভাই, সেই যে ছোলটা রোজ যে গান গাইতে গাইতে ডালহৌসি, ঘাস ফিরতি বাসে ফিরে আসে, তার জন্য, তাকে একটু...।

আমার কথা শেষ হবার আগেই স্টার্টার ভাইটি বলে উঠল, আপনি জানেন না। ওর মা ও বোন অনেকদিন অসুস্থ ছিল। নিত্য সঙ্গী অনাহারের জ্বালায় পাঁচদিন আগে ওরা মারা গেছে। ছেলেটি মা ও বোনের সৎকার করে এসে রাত্রি বেলা নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

অব্যক্ত যন্ত্রনায় আমার শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল চিৎকার করে উঠে বললাম, এ সম্ভব নয়। আমার সচেতন মন বলে উঠল, ভগবান আমাকে ক্ষমা কর, কথা দিয়ে আমি কথা রাখতে পারলাম না, সেই রাগেই হয়ত ছেলেটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

আমার মন বলে উঠল সবার মত আমিও মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ছিলাম ছেলেটাকে। মিথ্যে হয়ে গেলাম আমিও। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে সব কিছু ভাবতে লাগলাম।

সেইদিনও রোজকারের মতন আমার সামনে দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মিনিবাসটা ডালহৌসির দিকে বেরিয়ে গেল।

একটি বৃষ্টির গল্প

সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী
বাংলা (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

চারদিক কালোকরে মেঘ জমেছে। নারকেল গাছের মাথায় মাথায়, মেঘেদের স্তর কালোকরে রয়েছে। চারদিকে কেমন ছায়াছায়া নির্জনতা। বোসদের পুকুর ঘাটে, বিলাস কুল গাছের নীচে বসেছিল। পরনে তার খাটো শাড়ী কালোরঙ যেন নিকষ কালো, কিন্তু মুখটায় যেন কোনো লাবণ্যময়ীর লাবণ্য চুরিকরে মাখা, তার হাসিটা বড় অস্বাভাবিক যে হাসিতে সে বড় বড় মাছ মারা জলের মাঝিকেও মনভুলিয়ে ডাঙায় তুলতে পারে, তার বয়েস বেশি নয় পনের কি সতেরো, সে নিজে জানে না। বিলাসীর সঙ্গে তার ছোটভাই ভোলাকে দেখা যায়। ভোলার মা কিন্তু বিলাসীকে মারে সতীনের সন্তানের প্রতি আক্রোশ মনে হয়। দ্বিতীয় ও পরবর্তী পক্ষবুলিতে সহজাত। ভোলা আজ স্কুলে যায় নি। বোসদের পুকুর পাড়ে দিদির সাথেই বসে আছে, ওর দিদি বিলাসীনি আমাকে দেখলেই এমন একটা হাসিহাসে যে প্রথম প্রথম আমার লজ্জা হত। এখন দেখি আমাকে দেখে হাসতে গিয়ে ও নিজেই লজ্জা পায় কিন্তু হাসিটা এড়াতে পারে না। আমি কলকতায় বিলাসের হাসির আকালিয়া ভঙ্গিমার কথা মনে করি আর তখনই মনে পড়ে ওর বাঁ চোখটা মাঝে মাঝে বাঁদিকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আমি সুবোধের চিঠিতে জেনেছিলাম বিলাসিনীর সাথে জয়নগরের এক মেজবরের সম্বন্ধ নাকি বাতিল হয়ে গেছে। বিলাসিনীর মাঝে মাঝে চোখটেরা বলে মনে হয়। যা হোক সেদিনের কথা বলছিলাম যেদিন বিপুল মেঘ করেছিল।

দাসবাড়ীর খিড়কী দিয়ে দাসবাড়ীর নতুন বউ পুকুর ঘাটে নেমেছিল। মেঘ মেদুর অম্বর। পুকুরপাড়ে বিলাসী আর বিলাসীর বছর সাতআটের ভাই ভোলা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভোলা একমনে কতগুলি কাচা পেয়ারার কামড়ে কষাক্ত মুখ আবার পেয়ারায় নিবদ্ধ করছিল। আমরা ভাবতেও পারিনা কলকাতা শহরে এখন যারা বাস করে তারা জানতেও পারবেনা কোন দিন কৈশোরের গ্রাম্য দুপুর কেমন হয়। যখনকার কথা বলছি তা নিশ্চয় এখনকার থেকে অনেক অগে তবু যেন মনে হয় সেই ভাদ্র মাসের দুপুরগুলিতে যখন হাইস্কুলের মাঠের ভাঙা দেয়াল টপকে, বই রেখে খোলা মাঠে প্রচণ্ড দৌড় দিতাম মনে হত এই আশমানের সমগ্র নিচেটাই আমার। আর আমার ছেলে যখন ভ্যান রিক্সায় করে ইস্কুলে যায়, মনে হয় এই আশমান তলের এক কানাকড়িতেও ওদের হক নেই। বিলাসী একমনে কী ভাবছিল? কেন তার বিবাহ ভেঙে গেল। মা কত গালদিলে, শাপান্তকরলে, সেসত্যি বড় দস্যিমেয়ে, বোসদের বাগান থেকে ফল চুরি করে, ছাগল চরাতে নিয়ে বনে বনে ঘোরে। মারামারি করে, আর পুকুরের জল তোলপাড় করে। দাসবাড়ির ছোটবৌটা জলে নেমেছিল ইশারাকরে ডাকছিল বিলাসকে।

—না বৌদি আমি এখন তেল দিইনি।

—আয়না পোড়ার মুখী 'তেল' দিইনি'

বিলাস ভোলাকে বলল— বাড়ী যা, আমি এই নেয়েই এলুম বলে বিলাস জলে ঝাপ দেয়, দাসবাড়ির ছোটবৌ এর বয়সটা বিলাসেরই বয়সি দুজনে জলছোড়াছুড়ি খেলা খেলতে থাকে।

হঠাৎ করে বিলাস চকিত হরিণীর মত বাঁশঝাড়ের দিকে তাকায়। বাঁশঝাড়ে ওপাড়ার সতু লুকিয়ে ছিল। কোন খানে লুকিয়ে ছোট বৌয়ের জলসিক্ত গায়ে বসে যাওয়া অঙ্গ বস্ত্র যখন যৌবনশ্রীকে প্রকট করছিল আর সতু যার একটু বদচরিত্র বলে বদনাম আছে সে দেখছিল ঠিক তেমনি এক ডালভাঙ্গা বাঁশঝাড়ের মধ্যে আর বাঁশঝাড় নড়িয়ে সে পালাল তার সারা গায়ে কাদার তাল মাখামাখি। আমি বেড়িয়ে এলাম যখন, তখন ছোটবউ বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে, আমাকে

পুকুর ঘাটে দেখেই বিলাসিনীর ঘরের দিকে দৌড় লাগাল। তার মুখে দুষ্টু হাসি, ঘাটে কাপড়টা তার যৌবনকে ধরেরাখতে পারেনা। কিন্তু চকিতা কৃষ্ণকলি যখন ছুটে গেল তখন আরম্ভ হল ঘোর বৃষ্টি।

২

বিলাসিনী আমার কাছে আসত না। তবে আমাদের বাড়ীতে আসত। তারা বড় গরীব মা মাঝে মাঝে কিছু দিত। বদলে বিলাসিনী আমার মায়ের কুটনো কেটে দিত। আমি বাড়িতে থাকলে থাকতুম আড়ালে আবডালে। বিলাসিনী আমাকে দেখলেই তার টেরা চোখে মিষ্টিহাসি হাসতো। আমি বিলাসির নাম জানতাম না। কোনও কথা প্রসঙ্গে তার কথা হলেই আমি বলতুম ও ওই কালো মেয়েটি...। আমি আসলেই লজ্জায় বিলাসি বড় থামের পাশে আড়াল নিত, জিজ্ঞেস করলাম

তোর নাম কিরে?

বিলাসী উত্তর দিল 'চন্দনা' বলেই দ্রুতবেগে ছুটে বেড়িয়ে গেল। কেন এরকম করল বুঝিনি, পরে মা বললে যে বিলাসীর নিজের মা বিলাসীকে চন্দনা বলেই ডাকতেন। আমাদের পাড়ার শেষ প্রান্তে জঙ্গল। একেবারে সোজা বর্ডার পর্যন্ত। সে জঙ্গলে কখনো হাতি আসেনি তবে হায়না আছে। আর শেয়াল তো কুকুরের মত, দুএকটা অন্য জীবজন্তুই আছে। আর একটা ছোট নদী আছে। নদীর নাম মুশরি। ধূপগুড়ির পাহাড়ে নদী ছোট্ট, কোথাও একটুকু বাঁকও আছে নেই বাঁকের ফাঁকে ফাঁকে জঙ্গল। সে জঙ্গলে আমি অনেক ঘুরেছি। আমার নেশাই ছিল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা। হাতে একটা বন্দুক নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতুম অনেকদূরে টিয়া বিলে। টিয়া বিল চার দিকে জঙ্গলের মাঝে পাহাড়ী পথে অমন বিল কেমন করে হলো তা জানিনে তবে টিয়াবিল শীতকালে মরশুমি পাখিতে ভরে যায়। এত পাখি আর আমি ছররা মারতুম আর পাখি পড়ত জলে। বালিহাঁসের মাংস বড় ভালো।

একদিন চারদিকে এক মেঘলা ভাব, অদ্ভুত আঁধার নেমে আসা ভাব আমি বেড়িয়াছি বনে। অনেক দূর না অল্প দূর জানি না আমার মনে হল দূরে জঙ্গলের আড়ালে কেউ বসে আছে খুব আস্তে গেলাম সে আপন মনে বসে আছে। বিলাসিনী সে জানতে পারেনি আমি কখন পেছনে দাঁড়িয়ে। সে গান করছিল না কিন্তু আমার কানে একটা বড় সুন্দর সুর আসছিল। মনে হয় ওর দেহের বিভঙ্গ থেকেই উৎসারিত হচ্ছিল তা। মনে হল যে আকাশের নিচে বাড়ী ঘর আছে সে আকাশের নিচে ও যেন পাড়াগেঁয়ে বধুটির প্রথম বাসরের মত সলজ্জ আর ওই জনমানবশূন্য গহনে সে একে একে আবরণ ঘুচিয়ে সুপরি নদীর পাড়ে বসে আছে একেবারে বাড়ীতে ফিরে আসা মুখরা মেয়েটির মত। আমার হঠাৎ মনে হল আমি কি তাকে দেখছি সে তার ছোট্ট ছেড়া কাপড়টি কেন খুলেরেখে বড় বড় কদম পাতায় শরীর ঢেকেছে? হঠাৎ উপর থেকে আমার বন্দুকের নলে ঠংকরে কী পড়ল। বিলাসনী টের পেল। বর্ণনা দিতে পারব না যে বিলাসিনী ঠিক কিভাবে পালালো। কাপড় টাকে হাতে নিয়ে সবুজ পাতার চন্দনা উড়েগেল। হঠাৎ করে সূর্যগ্রহণের মত। পড়ে রইল কতগুলি কদম ফুল আবার ঘোর বৃষ্টি নামলো।

৩

বিলাসিনী আর আসতোনা সহজে আমার আশে পাশে। আমি কলকাতা থেকে গাঁয়ে ফিরলেই আর বিলাসি আসতো না। তবে জানলার বাইরে কোত্থেকে কদমফুল রাখা থাকত। আচ্ছা বিলাসিকে কে বলেদিল আমি কদমফুল ভালোবাসি।

কলকাতায় শত ব্যস্ততায় তুচ্ছতার কথা মনে থাকে। তবু যেদিন মায়ের চিঠিতে বিলাসির বিয়ের কথা শুনলাম, মনটা বড় চঞ্চল হয়ে গেল। কেন যেন একটা অদম্য ইচ্ছা হচ্ছিল। তবে সেই ইচ্ছাটা কিসের বুঝতে পারিনা। হঠাৎ করে চাইলাম প্রচণ্ড বৃষ্টিহোক— হল না।

দিন অনেকগুলি কেটে গিয়েছে। বিলাসিনীর স্মৃতি মুছে যায় নি। তবে ফিকে হয়েছে কিছুটা। বিলাসির বিয়ের পরে

কয়েকবারই বাড়ীতে গেছি। বিলাসী কখনও এসেছে বলে শুনিনি। দিন চলে গেছে একের পর এক। অসম্ভব ইচ্ছা নিয়ে সুপরি

নদীর ধার ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, নিস্তব্ধতার কোথাও যদি কোনও ফাঁকে বিলাসিকে দেখা যায়। কখনোও ঝোপ নড়েও উঠেছে, কিন্তু মনের ভ্রমকে আরও ভ্রান্ত করে দিয়ে সময় কেটেগেছে।

বছর কেটে গেছে মনের স্তরের ডউপর স্তর পড়েছে। তবু জল তোলপাড় করে কেউ ঘাটে নাবলেই জানলা দিয়ে দেখেছি, না বিলাসি নয়। বিলাসির ভাই ভোলা একটু একটু করে বড় হয়েগেছে। এখন সে মাঠে ফুটবল খেলে। আমি যদিও বাজারে যাইনা তবু কেউ কেউ ওকে বাজারে বিড়ি খেতেও দেখেছে একথা শুনেছি। কেন জানিনা বিলাসির কথা শুধাতে কেমন যেন লজ্জা হয়েছে। হঠাৎ করে নিজেকেই মনে হয়েছে বিলাসিনী, মনে হয়েছে ছুটে পালিয়ে যাই। এটা কোনও গল্প নয়, এর শেষ তবু এখানেই। কিন্তু শেষেরও তো শেষ থাকে আমি মাঝেমাঝেই বিলাসিকে দেখতে যেতাম, ভুলে মনে হত, সে পুকুরে নাইতে এলো বুঝি সে জল তুলতে চলল। কাঁখে কলস, না সত্যিকারের বিলাসিনীকে দেখিনী।

" প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর

* * * *

তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকোর যাত্রী এই বাঙালি কবিকে,
বুঝি না নিজেকে"।

— সমর সেন

ভারতীয় ক্রিকেটের অধঃপতন

রুম্পা চৌধুরী
ইতিহাস (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

১৯৮৩ সাল, এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছবি। ভারতীয়দের হৃদয় কম্পন ঘটিয়ে ভারত জিতে নিল বিশ্বকাপ ক্রিকেট। কোটি কোটি ভারতীয়দের স্বপ্নকে সার্থক করে যখন ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব হাতে কাপ তুলে নিলেন, তখন ভারতীয়রা তাঁকে বুকে স্থান দিয়েছিলেন এক মহান ব্যক্তি হিসাবে। কিন্তু এখন কপিলদেবের নাম শুনলেই সেই ভারতীয়দের মুখে শোনা যায় তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার বাণী। ভারতীয়রা তাদের হৃদয় থেকে মুছে দিয়েছে কপিলদেবের নাম। হ্যাঁ এই কপিলদেব আমারও এক সময় শ্রদ্ধার ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু শুনলাম কপিলদেব 'বেটিং' কেলেঙ্কারিতে জড়িত, তা সেদিনও মন থেকে মেনে নিতে পারিনি তাঁর প্রতি সমালোচনা, যখন B.B.C.-তে তিনি ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিনও বলেছিলাম তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে করছে। কিন্তু এখনতো সব প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

আজহারউদ্দিন, যিনি কিনা নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বলেই ফেললেন যে সংখ্যালঘু বলেই তাঁকে বদনাম করা হচ্ছে। তাঁর এই উক্তি থেকেই তাঁর চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি কি চরিত্রের ব্যক্তি। তাঁর উক্তি দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারত। যাঁদের সম্বন্ধে ভাবাই যায়নি যেমন জাদেজা, নয়ন মোঙ্গিয়া, প্রভাকর, নিখিল চোপড়া এঁরাও জড়িত (বেটিং কেলেঙ্কারিতে)। জাদেজাকে বাঁচাবার জন্য অবশ্য এখন তাঁর ভাবী শাশুড়ি আপ্রাণ চেষ্টা করেই যাচ্ছেন।

১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বিনোদ কাম্বলির চোখে জল দেখে আমারও সেদিন চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেই কান্না ছিল, অপরাধ ঢাকা দেবার পদ্ধতি। কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী যখন সারা রাত লাইন দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখতে যান, তাঁদের দেশের জন্য, প্রিয় খেলোয়াড়ের জন্য গলা ফাটার, তাঁরা যখন জানতে পারেন যে এই খেলার ফলাফল আগেই ঠিক করা আছে, তখন তাঁদের মনে কি ঘটে তার কি একটুও আন্দাজ নেই এঁদের। যাঁরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে প্রাণ দিয়েছেন সেই স্বাধীন দেশকে বিকিয়ে দিতে এঁদের কি হাত কেঁপে ওঠে না। টাকার থেকে সম্মান বড়। অথচ এঁরা সম্মানকে পায়ে পিষে দিয়ে টাকা রোজগার করছেন। খেলে এবং বিজ্ঞাপন করে যে পরিমাণ টাকা এঁরা পান, তাতেও কি এঁদের শান্তি হয় না? এখন লোকের মন থেকে ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা উঠে গেছে। সেদিন আমি, আমার এক বন্ধুকে ক্রিকেটের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলেছিল, 'কি দেখব, খেলার ফল তো আগেই ঠিক হয়ে গেছে'— অর্থাৎ এ কথা থেকে বোঝা যায় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে 'বেটিং' ঘটনা কতটা আঘাত করেছে। আমি কোনদিন আশাও করিনি যে আমার ক্রিকেট প্রেমী বন্ধুটির মুখে এই ক্রিকেটের বিদ্বেষের কথা শুনব। আমি সেদিন কাগজে পড়লাম যে এখনো হায়দ্রাবাদের লোক আজহারের পাশে। আমার মনে হয় তাদের বিকৃত মস্তিষ্ক না হলে তারা কখনো এই কাজ করতে পারে না।

আমি জানি না আদৌ এঁদের দোষ প্রমাণিত হবে কি না, জানি না প্রমাণিত হলেও এঁরা শাস্তি ভোগ করবেন কিনা। তবে যাঁরা দেশকেও জনগণকে ফাঁকি দিয়েই টাকা রোজগার করেন, তাঁদের রেহাই পাবার কোন অধিকার নেই।

'সমাজ এবং সামাজিক অবক্ষয়

দিলীপ কুমার মাইতি
ভূগোল (সাম্মানিক) — তৃতীয় বর্ষ

জিজ্ঞাসিছ আমি কে?

আমি এই মানব সভ্যতার জীবন্ত জীবাশ্ম। আমি-ই-রামায়ণের রামচন্দ্র এবং মহাভারতের অপরাজেয় অর্জুনের বংশধর। বহুকালের ঘটনাবলীর চলন্ত সাক্ষীর বংশধর, মানুষ।

আমায় প্রশ্ন করিলেন, আমার জন্ম কিভাবে হইল? ইহা লইয়া আমার পূর্বপুরুষগণ অদ্যাবধি, দ্বিধাগ্রস্ত। একদল বলিয়াছেন এক আশ্চর্যঘন মুহূর্তে সর্বময় নিয়ন্ত্রক ঈশ্বর-ই আমাদিগের জন্মদাতা। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ অবাস্তব অস্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা জটিল রাসয়নিক যৌগরূপে আমাদিগের উৎপত্তি জ্ঞান করেন। আমাদিগের মাত্র দুইটি শাখা; একটি পুরুষ, অপরটি মোহময়ী নারী।

জানিতে চাহিয়াছেন কেন এই নাম?

বোধকরি ইহাই ভাবিয়াছেন যে, সকলের যেমন একটি করিয়া ডাকনাম রহিয়াছে ঠিক তদ্রূপ আমাদিগকেও উক্ত নামে আপ্যায়ন করা হয়। আসলে তাহা নহে। আমাদিগের বৈশিষ্ট্যাবলীর সহিত সাযুজ্য এইরূপ নামকরণ। আমাদিগের এক আশ্চর্য ক্ষমতা রহিয়াছে যাহার কারণেই আমরা এই বৃহৎ জগতের একাধারে শাসক, বিচারক এবং নিয়ন্ত্রক। আমাদিগের রহিয়াছে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচারবোধ, সংযমী ধারণা। আমাদিগের চিত্ত সর্ব বিষয়েই অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রাচীন বসুন্ধরাকে আমরা করায়ত্ত করিয়াছি। পৃথী ভাবিয়াছিল তাহার দুর্দম শক্তি দিয়া আমাদিগকে দমাইয়া রাখিবে; কি হাস্যকর! পিতার যে পিতা থাকেন— তাহাও এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ধরিত্রীর অজানা ছিল। সর্বাপেক্ষা মূল বিষয় এই যে, আমাদিগের মধ্যে মানবিক গুণ রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মানুষ।

এইবার নিশ্চয়ই জানিতে চাহিবেন কয়েক যুগ ধরিয়া এই পৃথিবীতে আমাদিগের দ্বারা কি প্রকার কার্যাদি সাধিত হইয়াছে?

আমরা ধরিত্রীকে তাহার কুমারীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে করিয়াছি শস্যশ্যামলা, সমস্ত জীবকুল আমাদিগের অধীন। সমস্ত বৃক্ষকুল আমাদিগেরই শাসনে আজও মূক রহিয়াছে। সিন্ধু-মেসোপটেমিয়া সভ্যতা হইতে শুরু করিয়া অগ্নি দ্বারা লৌহ গলাইবার পর আমাদিগের আর কেহ রুখিয়াছে? মহাশূন্যে, ভিন্‌গ্রহে, উপগ্রহে, মহাসমুদ্র, পাতালপুরী— সর্বত্রই এখন আমাদিগের দাপট। ইহা ব্যতীত বর্তমানের আধুনিকতার ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

বোধ করি, উপরিউক্ত 'আধুনিকতা' শব্দটি শ্রবণমাত্র কিয়ৎ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন।

শ্রবণ করুন, বর্ণনা করিতেছি।

আমরা সমস্ত প্রদানে সমর্থ; গরল হইতে শুরু করিয়া অমৃতসর্বস্ব। অবশ্য প্রদেয় অমৃত কেবলই রসনাগ্রাহী জিহ্বা সন্তুষ্ট হয়, অমরত্ব লাভ সম্ভব নহে। আমরা আনন্দের সময়ে, ইহার মহলে আড্ডা মারিবারকালে কিংবা উত্তেজিত হইতে, সর্বপ্রকার দুঃখ ভুলিয়া যাইতে, সমস্ত কিছু চাওয়া-পাওয়া হস্তগত করিতে আমাদিগের সময়োপযোগী প্রিয় সুহৃত 'সুরা' সঙ্গ দিয়া থাকে— যাহাকে অনেকে 'মদ্য'-নামে সোহাগ করিয়া ডাকেন। তাহার সহিত 'বায়ু সেবন' আমাদিগের ট্র্যাডিশান।

এক্ষণে আসি বাসগৃহের রচনাশৈলীর ভাবে। বাসগৃহ তথা আবাসস্থল গগনচুম্বী হইলেই আমাদিগের গর্ব, আত্মাভিমান, আভিজাত্যও তৎসব উচ্চতা প্রকাশ করিয়া থাকে। নানানস্থানে নানান বৈচিত্র্যের রঙ্গমেলা, কক্ষে-উপকক্ষে রকমারি ক্রিয়াকলাপ এবং রূপমাধুর্যের সমাহার করিয়া থাকি।

ইহার পরক্ষণেই আসি আমাদিগের সবচাইতে সখের প্রিয়দ্রব্য পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে। এই বিষয়ে অবশ্য রূপ

রস-গন্ধহীন প্রবীনগণ অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া চক্ষু ও মুখশ্রী বিকৃত করিয়া কি যেন বলিয়া বেড়ান— তাহা ঠিক ঠাহর হয়না বাপু! আমাদিগের পুরুষেরা নিজ অবয়ব পূর্ণাঙ্গ রূপে চিত্র-বসনাবৃত করিয়া অকারণে সূর্য-কিরণ-স্পর্শ হইতে সাবধান থাকেন। অন্যদিকে আমাদিগের প্রিয়াগণ, সখীসমাজ তথা রূপে যৌবনে ঢলিয়া পড়া যুবতী নারীগণ মাধুর্যে সত্যই অতুলনীয়। সভ্যতার রশি ধরিয়া আধুনিকতাকে পাথেয় করিয়া তাহাদিগের বহুকালের ইপ্সিত মনোবাঞ্ছামত স্ব-অঙ্গশোভা বর্ধন করিয়া নানারূপে মহিমান্বিত হইয়া সর্বসম্মুখে উপস্থিত হইতেছে নির্দ্বিধায়। তাহারা বলিতেছে সভ্যতা সর্বদিক দিয়া প্রভূত উন্নত হইতেছে, কিন্তু সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদিগের বস্ত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিলে সভ্যতার প্রতি অবমাননা করা হইবে। তাহারা সভ্যতার উন্নতিকে প্রমাণ করিতে চায় কত-কিঞ্চিৎ পরিমাণ অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়া অঙ্গশোভা বিকশিত করা যায়— তাহার বিচারে। তাহারা, দেহখানি যত বেশি পরিমান উন্মুক্ত করা যায় তাহার সুপরিকল্পিত প্রয়াস করিয়া থাকে। ইহা কিছুমাত্র বাহুল্য নয়, প্রয়াস ও ফল মাত্র। ইহার দ্বারা পুরুষদিগকে প্রলোভনে লইয়া আসিয়া কিপ্রকারে সুখ ও ভোগেরপাত্র করা যায় তাহার প্রয়াস মাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে একটা উক্তি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, সমস্ত পুরুষজাতি কিংবা সমস্ত নারী জাতি যে এইরূপ আধুনিকতা সম্পর্কিত অভিযোগের শিকার কিংবা, কেবলই পুরুষজাতি অথবা কেবলই নারীজাতি যে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত তাহা নহে। আধুনিকতার করস্পর্শে উন্মত্ত, শৃঙ্খলহীন নারী-পুরুষই এইরূপ অভিযোগের শিকার বলিয়া ভাবিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

যাহা হউক, উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীনগণের মত হইল— ইহা সভ্যতার অগ্রগতির পদচিহ্ন নহে; সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অমানবিকতা, মূল্যবোধহীনতা মাত্র। পোশাকের পরসঙ্গক্রমে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ইহা পোশাকের দৈন্যতামাত্র, ইহার দ্বারা আদিম রীতির পুনঃপ্রবাহ ঘটিবে। তাহা হইলে এইরূপ আধুনিকতার দ্বারা কিরূপে সভ্যতার উন্নতি সূচিত হয়?

এইবার অন্যকথায় আসা যাক। আমাদিগের সমাজ অর্থনৈতিক সুযোগ্যতার বিচারে দ্বিধা বিভক্ত। অর্থে এবং শক্তির দৈন্য ভোগকারী গণকে এক শ্রেণীতে এই এই সমস্ত দিয়া কুলীন সম্প্রদায়কে অপর এক শ্রেণী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা তো তুচ্ছ ব্যাপার, তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে সমর্থ হইব কি প্রকারে? যাহাদিগের এইরূপ বিকৃত, ভাবমূর্তিহীন সমাজের সহিত তালমেলানোর দক্ষতা নাই, সমাজকে প্রদান করিবার ন্যায়; প্রদর্শনের নিমিত্ত আপাদমস্তক দেহখানি ব্যতীত কোন প্রকার সম্বল নাই— তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করি কি প্রকারে? তদুদ্দেশ্য আমরা তাহাদিগকে পশুর তুলনায় স্বল্পোন্নত ভাবিলেও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে যে অপারগ— তাহা আমাদিগের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

এইবার আসা যাক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভূমিকায় আমাদিগের গৌরবময় অবদানের কথায়। ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে আমরা যাহা ছিলাম তাহার চাইতে আরও অ্যাডভান্স হইতেছি। তাই ব্যক্তিগত জীবনে আমরা আপন পিতামাতার কথা স্মরণ করিতেও আবসর পাই না। এই প্রসঙ্গে সমাজের একটি সুচিত্র লক্ষ্য করিবার বিষয়—

[দু'দিন পরে যার জুটবে নাকো আহার,
কমে'না তার সিগারেট আর সানগ্লাসের বাহার]

আমাদিগের বর্তমান সভ্যতার এক প্রধান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রেম নামক একপ্রকার দুর্বোধ্য লীলা খেলা। একটা বিষয় ভুল করিলাম। তাহা হইল এই যে, প্রেমে বল বর্তমানে রহিয়াছে তাহা নহে; পূর্বেও ছিল। তবে বর্তমানের প্রেম ভিন্ন রঙের, ভিন্ন ভাবের, ভিন্ন স্বাদের যুগপোযোগী সংস্কৃতি। বর্তমানে প্রেমের কপোত কপোতীর মানসিক ভাব-প্রতিক্রিয়া বোধ হয় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই পথে-প্রান্তরে, হেথায়-সেথায় এই প্রকার সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়াছে। জামা বদলাইবার মতনই প্রেমিকগণের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা, নিত্য নূতন চাওয়া-পাওয়া বদল লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করি—

[সত্যি রোমাঞ্চকর! যখন বলে একে অপরকে ছাড়া বাঁচবে না। কিন্তু দেখে অবাক লাগে ক'দিন পরে যখন কেউ কাউকে চেনে না। একসঙ্গে সিনেমা যাওয়া— এতো তুচ্ছ ব্যাপার, বারে যেতেও পারে, তাই বলে কি তাকে কখনও বিয়ে করে ঘরে আনতে পারে?]

এইবার আমাদিগের ভ্রাতৃত্ব-বোধের মহত্ব প্রসঙ্গে আসি। আমরা যাহারা বিত্তশালী, আমাদিগের প্রতিপত্তি এবং প্রভাব প্রদর্শনার্থে আধুনিক অস্ত্র পরীক্ষার নিমিত্ত অধমের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকি ও মনে মনে অট্টহাস্য করি। আমরা জাতিভেদ প্রথার গোঁড়া ভক্ত সদৃশ আচরণ করিয়া থাকি। অনেকানেক রাজনৈতিক নেতা, 'গণ্যমান্য, দেশবরেণ্য দশের প্রমাণ' যাঁহাদিগের পদতলে তাঁহারা সমস্ত প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া জনসমর্থন লাভ করিয়া পক্ষান্তরে কিরূপে তাহাদিগের অস্তিত্ব বিনাশ করা যায়— তাহা লইয়া সদাসচেষ্ট রহিয়াছেন। আমরা এতই আধুনিক যে; আপনজনের সহিত, পার্শ্বস্থ পরিবার বর্গের সহিত সুসম্পর্কে নষ্ট করিয়া কোলাহল করিতে কম যাই না। আমরা নিজদিগকে লইয়া গৌরব ন্বিত যে ইহাই আমাদিগের 'মর্ডান ফ্যাশন'। আমরা সর্বত্র কাটাকাটি এবং হানাহানির অনল শিখ সদা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখি। নূতন কিছুর উদ্ভাবন ঘটাইয়া যুদ্ধের বিভীষকাকে আমন্ত্রণ করি। সংঘর্ষ, মারামারি, রক্তের নদী এখন অতি সাধারণ এবং অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাদাগিরি, বোমাবাজির মতন সর্বজন-গ্রাহ্য প্রশংসনীয় কুৎসা ঘটাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমরা সভ্যতার সু এবং কু-কর্মে আমাদিগের প্রতিভূ কম্পিউটারের ফলপ্রসূ ব্যবহার দ্বারা আমাদিগের ঐতিহ্যকে উচ্চ সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে আগামী শতাব্দীর নবীনতম সংযোজন যন্ত্রমানবের ভাবী ক্রিয়াকলাপে আমরা পিপাসার্তের ন্যায় দারুন আশাবাদী। ইহা কেবল আমাদিগের আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভকাল মাত্র; কালে কালে আরও কত দেখিবেন।

তবু এক ভয়াল রোমহর্ষক স্বপ্ন আমাদিগকে তাড়া করিয়া ফেরে। আমরা স্বপ্ন দেখি, আমরা আবার যথার্থ অর্থে মানুষ হইতেছি। কী দুঃস্বপ্ন! মানুষ হইবার এই বিপদ হইতে আজি কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? আপনারা পারিবেন কি?

"ও চির প্রণম্য অগ্নি
আমাকে পোড়াও।
প্রথমে পোড়াও ওই পাদুটি যা চলচ্ছক্তিহীন
তারপর যে হাতে আজ
প্রেম পরিচ্ছন্নতা কিছু নেই।
এখন বাহুর ফাঁদে ফুলের বরফ
এখন কাঁধের পরে দায়িত্বহীনতা।"

— শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

'আমাদের দায়িত্ব'

অনুজ গঙ্গোপাধ্যায়
শিক্ষাকর্মী

চাহিদা থাকলেই অভাব থাকবে। অভাবের আয়তন যত বৃদ্ধি পাবে অনুভূতির তীব্রতাও সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। কোন কিছুর অভাবে অনেক কিছু দূরে চলে যায়। এব্যাপারে একটু লক্ষ্য করা যাক।

আমাদের দেশে একটা জিনিষের অভাব বহুকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে সেটা হলো জাতীয়তাবোধের বা ভারতীয়ত্বের বা দেশাত্মবোধের অভাব। দৌলত খাঁ লোদী, মীরজাফর এবং বিভীষণ এদের কথাটা স্মরণ করলেই অনেকটা বোঝা যাবে।

নিঃসন্দেহে বৃটিশ ভারতবর্ষে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিল আমাদের দেশাত্মবোধের অভাবে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার সংক্ষিপ্ত কারণ দেশাত্মবোধের অভাব।

স্বাধীন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন দেশ ভাগ হওয়া। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বিংশ শতকের প্রথম দিকে যে ঝড় তুলেছিল তা কতটা প্রবল বোঝা যায় বিংশ শতকের বিভিন্ন প্রশ্নপত্রে বঙ্গ-ভঙ্গ-এর উপস্থিতি দেখে। স্বভাবতঃই বঙ্গ-ভঙ্গ করে স্বাধীনতার সময়ে যে ক্ষত ব্রিটিশ সৃষ্টি করেছিল আজ তা কর্কট রোগে পরিণত। প্রকৃতপক্ষে এই বঙ্গ ভঙ্গের জন্যে এবং অধিবাসী বিনিময় না করার জন্যে ব্রিটিশ শাসকদের দায়ী করার থেকে নেতৃবৃন্দের দেশাত্মবোধের অভাবকে দায়ী করা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরাধীন কোন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বা যুদ্ধ বা বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হয় অন্যভাবে। বিপ্লব বা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হ'লে ঐ প্রক্রিয়া শেখায় দেশাত্মবোধ। আমাদের দেশে স্বাধীনতায় বিপ্লবের রক্ত ঝরলেও তা অসংগঠিতভাবে ঝরেছে এবং কখনই সেই সংগ্রাম সর্বাত্মক হয়নি। জনগণ যখন রক্ত ঝরিয়ে, আপনজনকে হারিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেন, তখন পরাধীনতার জ্বালা আর মুক্তির আনন্দের পার্থক্য বোঝেন। দেশাত্মবোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নের।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর উচিত ছিল দেশাত্মবোধ সম্পর্কে একটা Schooling-এর, যার মাধ্যমে আমরা শিখতে পারতাম দেশ কি, জাতি কি, দেশাত্মবোধ কি এবং দেশপ্রেম কাকে বলে ইত্যাদি। কিভাবে করা যেত, সেটার সম্পর্কে রাষ্ট্রনেতারাই ছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু তা করা হয় নি । তারফলে আমরা স্বাধীনতা আর পরাধীনতার তফাৎ বুঝি না। মাঝে মাঝে কোনো অশীতিপর গুরুজনকে বলতে শুনি এর থেকে ব্রিটিশ ছিল ভালো। অবশ্য একথা বলেন সখেদে। আমরা যে দেশাত্মবোধ সম্পর্কে অনেকেই বুঝতে চাই না তার প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়—তবে তা অত্যন্ত বিতর্কিত হয়ে উঠবে। তবুও এ আলোচনা আজ অপরিহার্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প কিছু কাল পরেই খুন হ'লেন জাতির জনক মহাত্মগান্ধী। হত্যাকারী হিসাবে সনাক্ত করে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। তবুও এই প্রশ্ন আসবেই এই জঘন্য হত্যার পিছনে কি একটা বড় চক্রান্ত ছিল না? গান্ধীজীর মত নেতাকে হত্যা করা কোনো একটা ছোটখাটো গোষ্ঠীর কাজ বা একটা উত্তেজনায় ঘটে যেতে পারে বলে মনে হয় না, আর তাই যদি হয় তবে স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ামক যারা তাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আসলে সেই সময়ে যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়েছিল—নিরপেক্ষভাবে সেই তদন্তের পুরোটা যদি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হ'ত তা হ'লে ভবিষ্যত ভারতবর্ষ উন্নত হ'ত। সেটা হয়নি বলেই তার খেসারত দিতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে পারে। এখানেও দেশাত্মবোধের অভাব।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। জাতীয় কংগ্রেস সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী নয়, উপরন্তু ইংরেজ বা ব্রিটিশ শত্রু একথা বলা যায় না।

কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রশ্নপত্রে পাওয়া যায়—জাতীয় কংগ্রেস কি বৃটিশ সরকারের নিরাপত্তা কপাটিক বা Safety valve হিসাবে কাজ করছে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও—ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে নেতাজীর সঙ্গে বিরোধিতা অনিবার্য। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই মহান ভারত সন্তান সম্পর্কে আর বিরোধিতা থাকা উচিত নয়। অবশ্যই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ঘটনা ও রটনা সন্দেহের মধ্যেই থাকে। সুভাষ বসুর জন্যে তদন্ত কমিশন হয়েছে একাধিক। একটা ব্যাপার অদ্ভুত—সেটা কমিশনের রিপোর্ট। এ ব্যাপারে যদি একটা লেখচিত্র আঁকা যায়, তবে দেখা যাবে প্রথমদিকে ৬০° উল্লম্বভাবে রেখাটি গতিশীল হয়ে উঠেছে। তারপর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ঐ গতিশীল রেখাটি একই জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে এসে থেমে যায়। গণিতের শিক্ষকেরা বলেন—দুজনের অঙ্ক যদি একইভাবে ভুল হয় তবে বুঝতে হবে ঐ অঙ্ক করার ক্ষেত্রে দু-জন নিশ্চয়ই আলোচনা করেছে। সুভাষ বসুর তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে জলঘোলা ঐ মন্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও গভীরভাবে প্রমাণ করে দেশাত্মবোধের অভাবকে। কারণ এখনও শোনা যায় সুভাষ বসুর জন্য তদন্ত করা উচিত আবার চিতাভস্ম আনবার জন্যে রাষ্ট্র প্রধানদের কারো উদ্যোগের কথা সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মানুষের জীবদ্দশার হিসাবে নেতাজী প্রয়াত হয়েছেন ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তাঁর প্রয়াণ দিবস ঘোষণা করা হচ্ছে না। কেন? এর অর্থ কি তদন্ত কমিশনগুলোর রিপোর্টের ওপর আস্থাশীল না হওয়া? তবে এই ঘটনা চরমতমভাবে দেশাত্মবোধহীনতার পরিচায়ক।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা। এক্ষেত্রে বড় জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র দু-তিন জন তাঁরই দেহরক্ষীরা তাঁকে হত্যা করলো? কিন্তু এক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট সর্বসাধারণের জন্যে প্রকাশ করা হয় নি। কারণ শুধু মাত্র দু-তিন জন দেহরক্ষীর সাময়িক উত্তেজনা এত বড়ো হত্যাকাণ্ডকে সম্পূর্ণ করতে পারে বলে মনে হয় না। আর যদি তা হয়, তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ামকদের চরমতম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ামকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। তাই শুধু দেশাত্মবোধের অভাবই বলতে হবে। এই সমস্ত কিছুর অভাবে রাজীব গান্ধীকেও প্রাণ দিতে হয় আততায়ীদের বিস্ফোরণে। এখানেও তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট? একটা প্রচলিত গ্রাম্য প্রবাদ "স্বভাব না যায় মলে"। মেনে নিতে হচ্ছে। এর পরেও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী নিহত হন।

আমাদের দেশের মতো গরীব দেশে একজন ক্রিকেটারকে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা টেস্ট ম্যাচের জন্যে সরকারী ও বেসরকারী সবমিলিয়ে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয় তা অনেক অনেক বেশী। এছাড়া ক্রিকেটাররা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে বিভিন্নভাবে (নিয়মনীতি মেনে) যে অর্থ উপার্জন করেন এককথায় তা বিশাল। ক্রিকেট জগতে একটা সময় আমরা ভারতবাসীরা গর্বিত ছিলাম। খেলার মানের মাপকাঠিতে না হ'লেও দেশপ্রেমের এবং ক্রিকেট প্রেমের মাপকাঠিতে। সময়টা অষ্ট্রেলিয়ায় 'ক্যারী প্যাকার' সিরিজের সময়। আজ ২০০০ সালের শেষ লগ্নে আমাদের মুখে কোন ভাষা নেই—ভাষাবিদদের ভেবে বের করতে হবে কোন বিশেষণ ক্রিকেট বেটিং-এ যুক্ত ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে। বিতর্কিত বিষয়। অনেকেই বলবেন এখনও প্রমাণ হয়নি। অনেক খুন হয়, সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদির অভাবে কেউ শাস্তি পায় না। এরকম ঘটনা অনেক ঘটে বা ঘটছে। মন্ত্রী থাকাকালীন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী বলেছিলেন ক্রিকেট-বেটিং-এর কোন শাস্তি হয় না। কিন্তু ক্রিকেট-বেটিং-এর থেকে দেশদ্রোহীতা কি প্রমাণ হয় না? প্রকৃত প্রমাণের পর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। বেটিং-এ যুক্ত ক্রিকেটারদের। না হ'লে আমাদের আরও খেসারত দিতে হবে।

কারগিল সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে একটা বাক্যই যথেষ্ট। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বেরোনোর পর সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল যে সর্বসাধারণের স্বার্থেই এই রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না। এই মন্তব্যের পর কি কি প্রশ্ন সহজাত ভাবে আসে তার বিবরণ দেওয়ার অবকাশ নেই।

আরও দেশাত্মবোধ-অভাবের উদাহরণ প্রকট হচ্ছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে সরকার শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করতে চলেছে। আমাদের দেশে যদি শিক্ষা, হাসপাতাল ইত্যাদি বেসরকারীকরণ করা হয় তবে তা হবে আত্মহননের রকমফের।

দেশাত্মবোধের অভাব অনেক কিছুর জন্ম দেয়—যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, দাবী আদায়ের জন্যে আন্দোলনের নামে জাতীয় সম্পত্তি করা ইত্যাদি। এসবই আমাদের দেশে বিদ্যমান। সবথেকে ক্ষতিকর যা তা হলো পরাধীনতাকে পরোক্ষে আহ্বান করা ।

যেভাবে বিভিন্ন সংস্থাকে বেসরকারীকরণের তোড়জোড় চলছে তাতে ক'রে ভারতবাসী নতুন করে পরাধীন হতে চলেছে। কারণ সমস্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ হলে সবটাই দেশীয় ব্যবসায়ীরা কিনবে এমন কথা নেই। মুক্ত বাণিজ্যের কালে বিদেশী ব্যবসায়ীরা আসছে - আসবে। অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ স্থাপনের হীন প্রয়াস চলছে।

সেমিনার, বিতর্ক, সভা-সমিতিতে আলোচনা, পত্র-পত্রিকায় লেখা—ইত্যাদির মাধ্যমে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মীরজাফর, বিভীষণরা আজও জন্মায়। তাদের থেকে সতর্ক থাকা আর তাদের নিষ্ক্রিয় করা আবশ্যক। সেটা পারে প্রকৃত দেশাত্মবোধ।

এখনও উদাসীন থাকলে বহুপ্রচলিত সংস্কৃত প্রবাদের সদ্‌ভবিষ্য হয়ে ভারতবাসীদের অপেক্ষা করতে হবে অনিবার্য বিনাশের জন্যে— যে বিনাশ সদর দরজায় করাঘাত করে তার উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

"তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ কর?
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ কর?
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ, ভাঙছ জেলা, জমিজমা ঘরবাড়ি,
পাটের আড়ৎ, ধানের গোলা, কারখানা আর রেলগাড়ি
তার বেলা?

—অন্নদাশঙ্কর রায়

Communalism: A curse for modern India

পল্লব গুহ
ইংরেজী (সাম্মানিক) — দ্বিতীয় বর্ষ

It is an inherent tendency of man to divide humanity on the basis of community. Communities can have different basis of identification- religion, language, culture and even colour. In a multicultural nation such as ours, it is quite obvious that the society would be divided into many communities. The varied cultures of different communities add to our national heritage an helps to enhance our national pride. The problem, however starts when a feeling of hatred is preached among the people of different communities. Such a dogmatic and unhealthy feeling prevalent among a community regarding others, can be termed as communalism.

As modem India today is progressing towards a better future and is doing better that ever in the fields like defence, science and technology, it is evident that what our country needs most at this crucial juncture is communal harmony and a peaceful atmosphere to work in. Without a cohesive national feeling, all our future plans regarding the upliftment of our country to a 'developed' status would remain unimplemented. Thus the importance of communal harmony cannot be underestimated.

It is a great failure in itself that even after fifty three years of our independence, we still don't quite seem to realise the true meaning of communal harmony. It is a common feeling among the majority that we are doing a favour to the minorities when we talk about communal harmony. This is a totally wrong idea as Indian citizenship is not dependent on the number of members present in a particular community. We must realise that from the vast number of Hindus to the almost negligible number of Zorastrians, we are all equally Indians.

Whenever an obnoxious incident such as the Babri Masjid demolition of 1992 or the Graham Steins murder of 1999 takes place, it not only shakes up the secular nature of our culture, but it also plays a big part in lamishing the reputation that India has gained over a number of centuries. We as Indians feel ashamed when we see foreign channels like CNN and BBC highlighting such news. This cannot be allowed to continue for long. It should be made clear to all the communal forces present in our nation that just for a few insane, dogmatic fanatics, the entire nation cannot suffer the blemish of a fundamentalist state. Our country is one with tremendous versatility. It has a vast geographical expanse. We will be unable to solve the problems of such a vast nation with narrow minds. We must, therefore try to broaden our minds. With the help of a broader mind we would be able to channelise the religious, social and political powers of our country for the welfare of common people.

It is important for all of us to remember that the world recognises us as Indians and not as members of any religions or ethnic group. Our national identity comes must before our religions one. India is the world's largest democracy. It is the duty of all the citizens of India to preserve and promote a democratic atmosphere. Communalism is the biggest enemy of any democracy, it is a curse for modem India. Together we must fight communal forces in order to save our national pride, our secular heritage.

Politics for Beginners

সৌমিত্রী ঘোষ
অর্থনীতি (সাম্মানিক) — দ্বিতীয় বর্ষ

1. **SOCIALISM**
   You have 2 cows – U give one to your neighbour.

2. **CAPITALISM**
   You have 2 cows – U sell one & buy a bull.

3. **COMMUNISM**
   You have 2 cows – The government takes both & gives you the milk.

4. **NAZISM**
   You have 2 cows – The govt. takes both & shoots you.

5. **COLLEGE UNIONISM**
   You have 2 cows – U teach them how to graze but don't bother about the milk.

6. **TRADE UNIONISM**
   You have 2 cows – The Govt. takes both, shoots one, milks the other & throws the milk away.

7. **DUAL FLOWERISM**
   You have 2 cows – So does your neighbour; U shout at your neighbour & take his cows.

রাকেশ দীক্ষিত
বি. এস. সি. (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

A boy's knowledge

At ten years of age a boy thinks' his father knows a great deal; at fifteen he knows as much as his father; at twenty he knows twice as much; at thirty he is willing to take his advice; at forty he begins to think his father knows something, after all; at fifty he begins to seek his advice; and at sixty-after his father is dead- he thinks he was the smartest man that ever lived

Resignation

A dissatisfied school teacher handed in her resignation with the following comment.

"In our public schools today, the teachers are afraid of the principals, the principals are afraid of the superintendents, the superintendents are afraid of the board, the board members are afraid of the parents, the parents are afraid of the children and the children are afraid of nobody.

Definitions

Atom Bomb	:	An invention to end all inventions
Neighbour	:	One who knows more about you than you do.
Etc.	:	A sign used to make others believe that you know more than what you really do.
Rumour	:	News that travels at the speed of sound.
Stupid	:	Smart, talented and unique person in demand.
Criminal	:	A guy no different from the rest of us.... except that he got caught.
Body	:	The stuff that hangs on your bones.
Traffic cop	:	One who whistles while working.

The New Horizon

সপ্তর্ষি বিশ্বাস

রসায়ন (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

After spending fifteen long years in school I am feeling a bit group up. 1 am now ' in a College- Asutosh College- The name I have heard so many times before. So renowned and so full of history. My grand father was a proud student of this college. After attending the college I felt that 1 have been exposed to a new horizon. Rules and regulations, ways and standard of teachings are altogether different. School-life is very important but still it was a bit boring too. We did not have any freedom there. All the time we had to be careful whether any teacher was watching us talking in the corridor. But here life is cool and amusing too. The off periods are of real pleasure. During this time most of us go to the College Canteen. Every one starting from Zakir Hussain and A.R. Rahaman to Nachiketa can be discovered there. There the drams have been replaced by some broken carum board and the tea-cups acting as the synthesiser, Some Udit or Nachiketa are in a pensive mood with their songs. The rest are giving the beats taking a sip of tea.

In so much of enjoyment I am missing some one- the old friends of my school. But here I have got new friends and all the Dadas and Didis are very helpful and friendly. 1 am trying to adjust myself to this new world.

Drug Addiction

সুস্মিতা সরকার

বি. এ. (সাধারণ) — প্রথম বর্ষ

Drug Addiction has become a worldwide curse in Modem times. As we know, Drug means a habit forming substances which is taken for pleasure or excitement. Drugs have been used by mankind for medical purposes since ages. But never before had the abuse of drugs caused such a world wide concern and posed an alarming menace. The abuse of drugs is now an international problem. Infact, drug abuse has become a craze among school and College students. The students of India are virtually being crippled by this meance. Drug habit has become a fashion among young students. They take drugs to be 'Modern' and for sheer fun. They also get addicted to drugs to overcome frustration and mental agony. Drug affects the health, mind and morals. Physically mentally, and spiritually it makes one weak.

So,

"Say No to Drugs,

and YES to life."

চিরনবীনতায় হরমোন

স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী
প্রাণিবিদা (সাম্মানিক) — তৃতীয় বর্ষ

দেহ মানুষের নানা ধরনের শারীবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধিলাভ করে। স্বাভাবিক নিয়মেই অন্য প্রাণীর মত মানুষও একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বাড়ে। একইভাবে দেহের বেশকিছু জটিল কার্যকলাপ জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে। জন্ম থেকে মৃত্যু, এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত হরমোন দ্বারা। মানুষের শরীরে কিছু কিছু গ্রন্থি আছে যার থেকে ক্ষরিত পদার্থ নানা শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে কিছু গ্রন্থিনালী যুক্ত এবং কিছু গ্রন্থিনালী বিহীন। নালীবিহীন গ্রন্থিগুলিকে 'অনাল' বা 'অন্তক্ষরা গ্রন্থি বলে যার থেকে হরমোন ক্ষরিত হয়। হরমোন একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ। ইহা জীবদেহে রাসায়নিক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের প্রতিটি হরমোনের ক্রিয়া সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত। হরমোনের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলেই সে শরীরকে বিকল করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীযৌন হরমোনের গুরুত্ব এবং ভূমিকার ওপরে আলোকপাত করা যাক। এইগুলি হল— ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH), লিউটিনাইজিং হরমোন (LH), ইস্ট্রোজেন হরমোন এব প্রোজেস্টেরোন হরমোন। স্ত্রী দেহে যৌন গ্রন্থিকে ডিম্বাশয় বলে, যা ডিম্বানু উৎপন্ন করে। পরিণত ডিম্বাশয় গ্রাফিয়ান ফলিকল, করপাস্ লিউটিয়াম প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত। যৌবনারম্ভে পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত FSH আদি ডিম্বথলি বা প্রাইমারি ফলিকলকে গ্রাফিয়ান ফলিকলে পরিণত করে। পরবর্তীকালে পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত LH-এর প্রভাবে পরিণত ডিম্বথলি বা গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হয়ে ডিম্বানু বা ওভামের নিঃসরণ ঘটায়। এই প্রক্রিয়া 'ওভুলেশন' নামে পরিচিত। বিদীর্ণ ডিম্বথলির অবশিষ্ট কোষগুলি করপাস্ লিউটিয়ামে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরোন ডিম্বাশয় থেকে নির্গত হয়। এই হরমোন দুটি স্ত্রী যৌন অঙ্গ গঠন করে, যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে এবং ডিম্বানুর রোপন, অমরা গঠন ও গর্ভকালীন অবস্থায় স্ত্রী দেহের পরিবর্তন সাধিত করে। বয়ঃসন্ধিকালে (সাধারণত ১৩-১৪ বছর) স্ত্রীদেহে ঋতুচক্রের আবর্তন ঘটে এবং এই আবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় ইস্ট্রোজেনের কার্যকারিতার ওপর। নবজাত শিশুকন্যার ডিম্বাশয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপরিণত ডিম্বানু (immatured egg) থাকে যার সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। এগুলির মধ্যে একটি মাত্র ডিম্বানু প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়ে পরিণত হয় এবং দেহের বাইরে নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়াই 'ঋতুচক্র'। এমন একদিন আসে যখন এই ডিম্বানুর সংখ্যা শূন্য হয় এবং ঋতুচক্র বন্ধ হয়। এই ঘটনাটি সাধারণভাবে 'রজোনিবৃত্তি' বা 'মেনোপজ' নামে পরিচিত। একজন স্বাভাবিক সুস্থ স্ত্রীলোকের মেনোপজ ঘটে ৪৫-৫৫ বছরের মধ্যে। কিন্তু ক্রোমোজোম গত কারণে, অনাক্রম্যতার জন্য বা ধূমপানের ফলে মহিলাদের ৪০ বছরের মধ্যেই মেনোপজ ঘটতে পারে। এই সময়ে স্ত্রীলোকেদের দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রজোনিবৃত্তির বিশেষ চিহ্ন বা লক্ষণ হল— মুখ, গলা, বুকের গাত্রচর্ম রক্তিমাভ হয়ে ওঠে। দেহের ত্বক কুঁচকে যায় এবং ত্বকের মসৃণতা হারিয়ে যায়।

স্ত্রীলোকদের জীবনচক্রের এই বিশেষ সময় থেকেই শরীরে হরমোনের ক্রিয়া শিথিল হয়ে পড়ে। যেহেতু প্রত্যেক মানুষ বিশেষত মহিলারা তাদের শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বিশেষ রূপে যত্নশীল। হঠাৎ এই ধরনের শারীরিক ভগ্নতা বা খর্বতা তাদের মানসিক অবসাদ গ্রস্ত করে তোলে। প্রত্যেক মানুষের মনের প্রভাব তার শরীরের ওপর রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এই সময় থেকেই শরীরের অনাক্রম্যতা কমতে শুরু করে। এই অবস্থায় তাদের স্নায়ুচাপ এবং রক্তচাপ দুইই বৃদ্ধি পায়। নানা বিষয়ে উদ্বেগ ও হতাশার ফলে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। মানসিক দুর্বলতা শরীরকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। হরমোনের কাজ শুরু হয় জন্মের মুহূর্ত থেকেই। বিশেষত হৃদপিণ্ডের ওপর হরমোন নানাভাবে ক্রিয়াশীল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হরমোনের প্রভাব জটিল হতে থাকে। একসময় হরমোনের ক্রিয়া

প্রক্রিয়ায় শিথিলতা আসে। হৃদপিণ্ডের ছন্দবদ্ধতা ক্রমশ বিঘ্নিত হতে থাকে এবং নানা প্রকার রোগের সূত্রপাত ঘটে। ঠিক একই ভাবে শরীরে অস্থি এবং অস্থিসন্ধির ওপর হরমোনের প্রভাব কমে আসার ফলে অস্থিসংক্রান্ত রোগের প্রকোপ দেখা যায়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে হরমোন এবং তার আনুসঙ্গিক কার্যকলাপ এই সব রোগের প্রধান কারণ। বর্তমানে প্রত্যেক পরিবারে পঞ্চাশ উর্দ্ধে মহিলাদের হৃদরোগ বা অস্থিগত রোগ একটা সাধারণ ঘটনা। অবহেলার ফলে বা সঠিকভাবে রোগের কারণ নির্ণয় না হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুও ঘটতে পারে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে—হরমোন, যা জীবনকে গড়ে তুলছে তাই এক সময়ে জীবনহানীর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এখন প্রয়োজন এর প্রতিকার। কিন্তু কীভাবে? প্রথমে দেখা যাক, আমরা রোগের চিকিৎসা করবো, না তার কারণের প্রতিকার করবো। এক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থে রোগের কারণের প্রতিকার করতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নতুন ক্ষেত্র Hormone Replacement Therapy (HRT)। যে সমস্ত যৌন হরমোনের শিথিলতার ফলে এই প্রকার রোগের সৃষ্টি সেই হরমোনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করা হয় এই থেরাপির সাহায্যে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সহজ। চিকিৎসাটি কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়। হরমোনের প্রত্যক্ষভাবে ট্যাবলেটের সাহায্য নেওয়া হয় বা ত্বকের ফ্যাটি টিসুর মধ্যে ইম্প্ল্যান্ট করে শরীরের ভিতর প্রবেশ করান হয়। যেহেতু প্রধানত ইস্ট্রোজেনের ঘাটতির ফলে রজোনিবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাই প্রধানত এই হরমোনের পরিবর্তিত রূপ প্রয়োগ করা হয়। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে—কিছু হরমোন, বিশেষত ইস্ট্রোজেন সরাসরি প্রয়োগ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার মহিলাদের জরায়ুতে ক্যানসারের প্রধান কারণ ছিল—ইস্ট্রোজেনের সরাসরি প্রয়োগ। সেই কারণে ইস্ট্রোজেনের সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ইস্ট্রোজেনের সঙ্গে প্রোজেস্টেরন—একসঙ্গে ট্যাবলেট রূপে ব্যবহার করা হয়। এই ট্যাবলেট সাধারনত একবছর ধরে খেতে হয় এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু এটি ব্যয়বহুল। মাথাপিছু প্রতিমাসে এই ট্যাবলেটে খরচ প্রায় হাজার টাকা। অপর পদ্ধতি অর্থাৎ হরমোন ইম্প্ল্যান্ট থেরাপি শুধুমাত্র বিদেশেই বর্তমানে প্রচলিত। ইস্ট্রোজেন এবং টেস্টোস্টেরন হরমোন একসঙ্গে মিশিয়ে ত্বকের ভিতর ফ্যাটি টিসুর মধ্যে অপারেশনের মাধ্যমে ইম্প্লান্ট (নিবিষ্ট) করা হয়। অপারেশনের সময় সাময়িক ভাবে অজ্ঞান করে হরমোন ইম্প্লান্ট করা হয়। এইক্ষেত্রে জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য টেস্টোস্টেরন ব্যবহার করা হয়। শুধু ইস্ট্রোজেন গ্রহণ করার থেকে ইস্ট্রোজেন-টেস্টোস্টেরন একসঙ্গে ব্যবহার অনেকবেশী কার্যকর।

এই চিকিৎসা বিদেশে বহুল প্রচলিত। কারণ সেখানকার মহিলারা তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেকবেশী সচেতন। নিজের প্রতি অনেকটাই যত্নশীল। সেদিক থেকে আমাদের দেশের মহিলারা নিজেদের সম্পর্কে বেশ উদাসীন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তাদের এইরূপ ভাবতে সাহায্য করলেও এটা মনে রাখা উচিত সমাজের ক্ষুদ্রতম একক পরিবার। একটি পরিবারের ওপর সেই পরিবারের কোন স্ত্রীলোকের ভূমিকা বা প্রয়োজন কতটা তা আলাদা বিচারের অবকাশ রাখে না। কোন একটি পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মহিলাদের নিজের পরিবারের স্বার্থের কথা ভেবে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের উৎকর্ষতা মাথায় রেখে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল থাকা উচিত।

'Hormone Replacement Therapy' একটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এর সাহায্যে হৃদরোগ, অস্থিগত রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানসিক অবসাদ থেকে নিষ্কৃতি মেলে, একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, সাংসারিক জীবন সুখময় হয়ে ওঠে। রেচন-জনন সংক্রান্ত ব্যধি নিরাময় হয়। ত্বকের মসৃণতা, স্থিতিস্থাপকতা অনেকটাই পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। যা সামগ্রিক জীবন যাত্রা মান উন্নত করে। এই কারণে গত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে Hormone Replacement Therapy কে সফলতম প্রতিষেধক বা Preventive Medicine রূপে গণ্য করা হচ্ছে।

Anti Influenza Drug

অভিরূপ মুখোপাধ্যায়
প্রাণিবিদ্যা (সাম্মানিক) — দ্বিতীয় বর্ষ

Necessity is the mother of invention i.e., when there is an urgent necessity to tackle a matter, inventory trials approach vigorously to overcome the hurdles of the matter. One such necessity is to eradicate the influenza virus from the earth which usually causes "Flu". It will be astonishing to see that this flu is even lethal epidemic which can be evidenced by the out break of Spanish Flu in 1918 that killed 30 million people and the Asiatic Flu along with the Hong Kong Flu causing a horrifying demise to hundreds of thousands of people world-wide. Basically, this viral disease is a genetic disease as the virus rapidly transforms its genetic material and becomes irrestible to the human defense system. Actually, there are two-surface proteins called "Hemagglution in and "Neuraminidase" which undergo alternation from time to time assisting it to develop a new epidemic era. Based on the variation of these proteins flu virus are classified into A, B, and C types, out of which A & B are more dangerous. Host cell surface consists of an unwanted sugary molecule called "Sialic Acid" to which the Hemagglutinin of the Influenza virus gets attached and thus, makes entry into a host cell. Then after replication of the RNA molecule, the new viral (Proteins develop within the affected host cell. Finally when the new viral particles bud out of a cell neuraminidase assist them in their mission of affecting cell). Thus understanding the blockage of the activity of the viral neuraminidase, the flu virus could be inhibited from spreading among the host cell. it is Peter Colman and his colleagues of CS IRO (Australia) who designed a new drug named ZANAMIVIR to block the activity of the neuraminidase on the viral surface. According to them neuraminidase consists of four balloon-like structures atop a single stick and each of this balloon consists of a deep central dent or cleft on its surface which is lined with a stretch of a few amino acids. The amino acid sequence is identical for all types of A & B flu virus.

This conserved region of the viral neuraminidase was found to be the active site and logically if this active site is jammed by plugging with a sui table drug then the spread of virus can be prevented. So ZANAMIVIR appears to be the only suitable drug for this purpose. Clinical trials have revealed that this drug has no side effects but the main draw back of the drug is that it has to be inhaled by nose or mouth into the respiratory tract. It does not work if swallowed as a pill. So as per peoples' preference to take pill, scientists at Gilead Sciences of - California invented a new drug named GS4104, which is a equipotent to zanamivir, and this can be taken in as oral pill. Recently zanamivir has been approved for sale in UK under the trade name "RELENZA".

So whenever one having a recurrent sneezing, runny nose, throat sore and itchiness in the inner lining of the respiratory tract he should guess that he is under the grip of a wily virus the influenza" virus, and immediately go for a treatment.

The Extinct Animals of the Past

সায়ন্তন সরকার
বি.এস.সি. (সাধারণ)

Nature is the place where we live in Nature gives us beautiful surroundings of trees, small plants and animals, If we observe carefully these animals and plant we see that they are quite able to adapt the changing conditions of the earth. But let us think of those animals who were unable to adapt the fast natural changes of earth and were unable to complete with their rivals for adequate food supplies. Those animals disappeared and are known as 'Extinct Animals'.

In 1901, some scientist discovered a fossil of long haired, soft skinned and brown coloured animal 'Mammoth'. It had elephant-like teeth which were 10ft. long. According to them, this animal had come to earth about thousands of years ago.

In this way the study of fossils began and it revealed that thousands of species of animals have come and gone since the creation of earth. Such as dinosaurs which become extinct millions years ago were never seen by a man. But now we may observe them through their skeletons and their bones in the museum.

There is a well-known proverb in English 'As dead as dodos'. This dodo is a bird which became extinct at the end of 17th century. This bird lived in the island of Mauritius. Inability to fly made this bird vanished from earth without trace by the hunting sailors. Another bird named 'Great Auk' is the another instance of extinction. This penguin-like beautiful bird lived in the north of Scotland.

But some hunters made their fortunes by collecting eggs and drove the bird to extinction in 1844 Another species of animal extinct today is 'Milu'.

The Scientific name of this animal is 'Elaphurus davidiaus'. This animal looked like a deer but not like the other ordinary deer. It had amasing and colourful horns and a very long tail. But they were almost wiped out by the hunters in 1920.

A New Zealand based bird 'Moa' which is about 10ft tall became lost their existence by the ancestors of Maoris about 600 years ago.

The extinction of any species of animal is very pathetic and distressing. We over whelm in sorrow when we come to know that man himself has been responsible for killing them and causing their extinction.

If adequate measures are not taken the animals that are now fighting for their existence would disappear from the earth's surface in near future.

"মশাবাহিত যে রোগটি ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায়!"

সজল ভট্টাচার্য্য
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ভারতে যেমন কীটপতঙ্গের বিপুল সম্ভার ও বৈচিত্র্য, তেমনি পতঙ্গবাহিত প্রধান রোগগুলোও এ দেশে বর্তমান। যেমন, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, এনকেফেলাইটিস, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি। প্রায় তিনদশক নীরবতার পর ১৯৯৪ সালে গুজরাটের সুরাটে আবার প্লেগের সংক্রমণ হয়। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়াও আবার ফিরে এসেছে নতুন করে। ১৯৬৯ পর্যন্ত কালাজ্বরের কথাই শোনা যায়নি। প্লেগের সংক্রমণ ছড়িয়ে থাকে 'র‍্যাটফ্লি' নামে পোকা। 'স্যাণ্ড ফ্লাই' নামের পতঙ্গ কালাজ্বরের বাহিকা। বাকি রোগগুলো মশাবাহিত। ভারতে প্রায় সব অঞ্চলের মশা দেখা যায়। চারশোর বেশী মশার প্রজাতি বর্তমান। মশাবাহিত একটি মারাত্মক রোগের নাম পীতজ্বর (Yellow fever)। ভাইরাস ঘটিত রোগটি আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় হয়। সৌভাগ্যবশতঃ রোগটি ভারতে এখনও পর্যন্ত হয়নি। তবে রোগটির ভাইরাস যে মশা বহন করে তা ভারতে ভালোমাত্রায় উপস্থিত। Aedes aegypti নামের মশাটি দিনের বেলায় কামড়ায়। শহরাঞ্চলেই এই মশাটি বেশী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ডেঙ্গু রোগের বাহিকা মশা Aedes aegypti। ডেঙ্গু সাধারণত শহরেই হয়ে থাকে তবে সম্প্রতি বাংলার জেলা ও শহরতলীতেও ডেঙ্গুর সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। পীতজ্বরের ভাইরাস দ্বারা এই মশাটি সংক্রামিত হলেএবং সেই মশা মানুষকে কামড়ালে মানুষ সংক্রামিত হয়। আফ্রিকায় কয়েক প্রজাতির বানরের মধ্যে এই ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। বনজঙ্গলের মশা ও বানরের মধ্যে সংবহন চক্রটি চলতে থাকে। শিকারী, কাঠুরে, পর্যটক ও অন্যান্য কারণে যাঁরা জঙ্গলে প্রবেশ করেন তাঁরা এই মশার দ্বারা সংক্রামিত হন। সংক্রামিত মানুষ শহরের Aedes aegypti মশাকে সংক্রামিত করলে রোগটির প্রকোপ শহরে শুরু হয়। একবার সংক্রামিত হলে সারাজীবন সেই মশার মধ্যে ভাইরাস থাকে। কোন কোন বিজ্ঞানী আশঙ্কা করেছেন যদি খুব সতর্ক ও সজাগ থাকা না যায় তাহলে এই রোগটিও ভারতে চলে আসতে পারে। কারণ বাহিকা মশা Aedes aegypti পোষক বানর ও এদেশের মানুষ এই ভাইরাসে সংবেদনশীল। ভারতের আবহাওয়াও এই রোগ সংক্রমণের অনুকূল।

পীতজ্বর রোগটি এখনও পর্যন্ত ভারতে না হওয়ার পিছনে সম্ভবত অন্যতম কারণ ডেঙ্গু ভাইরাসের উপস্থিতি। দুটি রোগের ভাইরাসই Group-Barbovirus। তাই ডেঙ্গুর সংক্রমণে উদ্ভুত অ্যান্টিবডি সম্ভবত ভারতের মানুষকে পীতজ্বরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে চলেছে। যদিও Group-Barbovirus হওয়া সত্ত্বেও জাপানী এনকেফেলাইটিস রোগটি জাপানে আত্মপ্রকাশের ১০০ বছরের মধ্যেই ভারতে মহামারির আকার নিয়ে উপস্থিত হয়, এই বাংলায় '৭২-৭৩ সালে। আমেরিকায় AIDS virus আবিষ্কারের কয়েকবছরের মধ্যেই ভারতে AIDS-এর আক্রমণ ধরা পড়ে। সুতরাং কোন প্রকার আত্মসন্তুষ্টি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। পীতজ্বর প্রভাবিত অঞ্চল থেকে আসা আন্তর্জাতিকবিমান, জাহাজ ভারতে পৌঁছনো মাত্র রাসায়নিক কীটনাশক স্প্রে করে বাহিকা মশা থাকলে মেরে ফেলা প্রয়োজন। যাত্রীদের প্রতিষেধক টীকা দেওয়া আছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। দেওয়া না থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত যাত্রী পীতজ্বর এলাকায় যাবেন ভারত থেকে, তাঁদেরও টীকা নেওয়া বাধ্যতামূলককরতে হবে। এসব নজরদারীতে যেন খুঁত না থাকে কোন, কোন গাফিলতি না হয়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বানর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি প্রাণী এদেশে আনার সময় দেখে নিতে হবে ভাইরাসের উপস্থিতি আছে কি না সর্বোপরী মশার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানো দরকার, বিশেষকরে পীতজ্বরকে রুখতে Aedes মশার বিরুদ্ধে।

হাজার হাজার মানুষ ভারতে প্রতিবছর মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হন। পীতজ্বর যাতে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য চাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সুষ্ঠু ও ফলপ্রসু পরিকল্পনা। চাই সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ। সাধারণ মানুষকে সচেতন করা ও মশা নিয়ন্ত্রণে তাদের অংশগ্রহণ একান্ত দরকার। আণবিক যুদ্ধের মতই ভয়ঙ্কর হতে পারে জীবান যুদ্ধ। কে জানে পৃথিবীর কোন্ গবেষণাগারে চলেছে মশাবাহিত ভাইরাস নিয়ে জীবান যুদ্ধের প্রস্তুতি?

"বাংলা ভাষার সঙ্কট — উত্তরণের দিশা"

পল্লব মুখোপাধ্যায়
উদ্ভিদবিদ্যা (সাম্মানিক), তৃতীয় বর্ষ

"মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।" নতুন শতকের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা মহাসমারোহে পালন করলাম বিশ্বমাতৃভাষা দিবস। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা এই বছর থেকে এই দিনটিকেই বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেছে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি— আমি কি ভুলিতে পারি'— এ সুরের ঝঙ্কার শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ নেই। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা ও তাকে জীবন ও জীবিকার বিবিধক্ষেত্রে সুপ্রযুক্তভাবে প্রয়োগ করার দৃঢ় প্রত্যয়ী শপথ গ্রহণে আজ তামাম দুনিয়ার মানুষ আমন্ত্রিত।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। " মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, অষ্টম হইতে দ্বাদশ— এই পাঁচ শতাব্দীই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ"— (সূত্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, লেখক— রাখালচন্দ্র মজুমদার— প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা ১৯৬)। আমাদের মাতৃভাষা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ভাষাগুলোর অন্যতম। আমাদের মনন, চিন্তন, সংস্কৃতি, আবেগ সামাজিক ও আর্থিক স্থায়িত্ব, জীবন-জীবিকা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ও করবে আমাদের এই ভাষার সমৃদ্ধি, বিকাশ ও সঠিক প্রয়োগের উপর। প্রকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির প্রেক্ষিতে মাতৃভাষাকেযুগোপযোগী করে তোলা, অত্যাধুনিক চাহিদাপূরণে তাকে সক্ষম করে তোলার দায়িত্ব আজ অতি অবশ্যই ভাষা-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের। কবিগুরুর কথায়— "ভাষার সে কী অমিত পারঙ্গ তা—আজকের মানবসভ্যতার চরমোৎকর্ষ তার পরিচায়ক"।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে প্রাথমিক ইংরেজী চালুর তথাকথিত গণদাবি শুরু হয়েছিল নব কলেবরে যা রাজ্যসরকার শেষ পর্যন্ত মেনে নন। আমাদের ঔদার্য, আন্তর্জাতিক মনোভাবকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে কোন কোন মহল তৃপ্ত হল। কিন্তু বছর কয়েক ধরেও মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে কোন আন্দোলন হয়েছে কি? সুধী পাঠক ভাবছেন তার দরকার কি? মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা এ রাজ্যের রাজ্যভাষা। তার এমন কি অবমাননা হয়েছে যে তাকে রক্ষা করতে আন্দোলনে নামতে হবে? হবে, হবে, নিশ্চয়ই নামতে হবে। পারিপার্শ্বিক একটু খতিয়ে দেখলেই দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হবে— পরাধীন যুগে যতটা হতভাগিনী মাতৃভাষা তার চেয়ে দারিদ্র্য বেড়েছে কয়েকগুণ, তখন পরণে কাপড় ছিল না, এখন পেটের ভাতে টান। আসলে, আমরা এই দারিদ্র্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন হতে ক্রমাগত অস্বীকার করছি।

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য বাংলায় আমাদের সবার একটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেন প্রতিটি শিশু দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। মাঝপথেই নানা কারণে পড়া ছেড়েদেবার সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনতে প্রাথমিকে এক এবং একটিমাত্র ভাষাই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সে ভাষা মাতৃভাষা— বাংলা।

মাতৃভাষা বাংলার ভবিষৎ, প্রাসঙ্গিকতা এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শিক্ষাতত্ত্বের দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ নিদারুণ বোকা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আজীবন শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও তিনি আসলে বাংলায় সাহিত্য লিখতেন, তাই শিক্ষায় ইংরেজীর কদরটা তেমন, অনুমান করতে পারেননি। মাতৃভাষায় শিক্ষা, 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সদৃশ' বলে অযথা বাক্যব্যয় করেছেন। এখন বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতেন পরাধীন অবস্থায় আমাদের সামনে বিশ্ব ছিল অবরুদ্ধ, মাতৃভাষা বাংলা জানলেই মুদিখানা, সেরেস্তা, জমিদারির কাজ চলে যেত, কিন্তু এখন কত ব্যাপক, বিস্তৃত জগৎসংসারে আমাদের বেছে বেছে সবাইকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে, তাই চাই ইংরেজী। মাতৃভাষা বাংলা না জানলেও বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই।

আমার চেনাশোনা ইংরেজী-বলিয়ে ৯ বছুরে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলে পাঠরত খোকাটি দোকানে গিয়ে দোকানদার আঙ্কেলকে বিদ্যাসাগরের ছবি খুঁজে দিতে বলেছে। স্কুলের বাংলার টিচার খাতার পাতায় বিদ্যাসাগরের ছবি সেঁটে বাংলায়

তিনটি বাক্য লিখতে বলেছেন। একেই বাংলা, তার আবার হোমটাস্ক। বালকের অভিভাবকের মনেই হতে পারে— টিচারের কী আস্পর্ধা। বালকের দোষ নেই। তাকে মাতৃভাষা অবহেলা করতে শেখানো হয়েছে। দোকানি সেকেলে লোক, ছবি বার করতে করতে বললেন, আমি তো বাপু ৪ বছর থেকে আমার মৃত পিতা আর ঈশ্বরচন্দ্র দুজনকেই ছবি দেখে প্রথম চিনতে শিখি। ওঁকে পেন্নাম ঠুকে খাগের কলমে তালপাতায় অ-আ লেখা শুরু করি। আসলে গোড়াতেই গলদ। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 'বর্ণ পরিচয়' রচনা না করলে ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক দাসত্বের আভিজাত্যে গর্বিত একটি দাস জাতিকে আর কষ্ট করে বাংলা শিখতে হতো না। বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুরের বাংলা ছিল পরাধীন, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমরাও লায়েক হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার তফাৎ ভুলেছি। এখন বুঝতে পারছি বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবিঠাকুর প্রত্যেকেই ভেতো বাঙালি এবং সংকীর্ণমনস্ক স্বভাবাওয়ালা ছিলেন। সেই পুরোনো হাফশিক্ষিত নিধুবাবু (রামনিধিগুপ্ত) যিনি বলেছিলেন— 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'— তাঁরই মতো গ্রাম্য ছিলেন। আমরা আধুনিক হয়েছি, এখন চেষ্টা অত্যাধুনিক হওয়ার।

মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা শিক্ষায় অপরিহার্য্যভাবে মাতৃভাষা মাধ্যমের ব্যবহার আজ একটা বকেয়া ও বাতিলযোগ্য ধারণা হয়ে উঠেছে। তা নিয়ে অধিকাংশ বাঙালির তেমন ভ্রুক্ষেপ নেই। এই নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিক্ষাসংস্থাগুলো, রাজনীতিকদের কোন আন্দোলন করতে দেখা যায়নি, পরিবর্তে আন্দোলন হয়েছে প্রাথমিক ইংরেজীর জন্য। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোনমতেই ইংরেজী ভাষার সমালোচনা কিংবা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়। আর পাঁচটা মানুষের মতই আমারও দাবি একটাই, মাতৃভাষার হারানো স্থান বাংলা ও বাঙালির কথোপকথনে, জীবন-জীবিকা, সরকারি বেসরকারি সর্বত্র ফিরিয়ে আনতে হবে আর এ কাজে উদ্যোগ নিতে হবে বাঙালিকেই। আমরাই সম্ভবত সেই জাতি যারা নিজের ভাষাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র গর্ববোধ করি না। ইংরেজীতে কথোপকথন আজ আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। ইংরেজী ভাষার দাপটে এবং তথাকথিত ভুবনায়নের তরঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার অস্বাভাবিক প্রান্তিকীকরণ ঘটেছে। এরি সমান্তরালে গোটা দেশব্যাপী হিন্দি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের প্রবল ঢক্কানিনাদে বাংলাসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার বিস্তার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তথাকথিত হিন্দি বলয়েও যেমন উত্তর বিহারে, অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা মৈথেলী, মাগধী, অঙ্গিকা, ভোজপুরী। দক্ষিণ বিহারে অনেক আদিবাসী উপজাতিদের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও বিহারের মানুষের অবস্থাও তথাকথিত বাঙালির মতোই। ইংরেজী বলতে পারা বাঙালির আভিজাত্যবোধের পাশাপাশি তারাও হিন্দিকে বেছে নিয়েছে আভিজাত্যবোধের নিদর্শনস্বরূপ। অন্যান্য হিন্দি বলয়েও একই অবস্থা, রাজস্থানী, হরিয়ানাভীকে কোণঠাসা করার চক্রান্ত চলছে।

১৯৯৭এ ভারতীয় জনগণনার ভাষা বিষয়ক পুস্তিকটি প্রকাশ করেন ভারতের জনগণনা আধিকারিক ডঃ এম. বিজয়নুন্নি। এ ছাড়াও 'ওয়ার্ল্ড অ্যালম্যানাক' ও বিবিধ তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গোটা বিশ্বের ভাষক মানচিত্রে বাংলার অবস্থানটা এরকম— দেশের সংবিধানের অষ্টম তফসিলের আঠারোটি ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম। গোটা দেশে হিন্দিভাষী ৩৩,৭২,৭২,১১৪ জন (প্রায় ৩৪ কোটি), এবং বাংলাভাষী ৬,৯৫,৯৫,৭৩৮ জন (প্রায় ৭ কোটি) । ভাষক সংখ্যাগত নিরিখে বাংলা ভারতে দ্বিতীয় ভাষা, হিন্দির পরেই বাংলার স্থান। গোটা দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলেও বাংলার স্থান ঐ একই জায়গায়। সমগ্র ভারতে প্রতি ১০,০০০ জনে হিন্দিভাষী ৪,০২২ জন ও বাংলা ভাষী ৮৩০ জন। বাংলার মধ্যে ৯৬.৬৪% মানুষ বাংলায় আর বাকি ৩.৩৬% মানুষ অন্য ভাষায় কথা বলেন। দেশের মধ্যে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দিভাষী ৩৯.৮৫%, বাংলা ভাষী ৮.২২%, ১৯৯৮ এর 'ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক' মোতাবেক, এ উপমহাদেশে হিন্দিভাষী ৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ ও বাংলাভাষী ২০ কোটি ৭০ লক্ষ। এথ্‌নোলগ নামে পত্রিকার সূত্র থেকে গ্রাইমস্ জানাচ্ছেন, তাঁদের হিসাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলার স্থান পৃথিবীতে সপ্তম। এ ভাষার ওপরে আছে চীনা, ইংরেজী, হিন্দি, রুশ, স্প্যানিশ ও আরবি ভাষা। শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাভাষীর সংখ্যা ২১ কোটির মতন।

বাংলা ও বাঙালি কোনমতেই প্রাদেশিক নয়। বাংলা আকাদেমী তৈরীর আগে উর্দু আকাদেমী নির্মাণ, কলকাতার বাংলা চ্যানেলের সময় মেরে উর্দু সংবাদ চাউড় করতে দেওয়া কি প্রাদেশিকতার পরিচায়ক? সংবিধানের অষ্টম তফসিল

মোতাবেক তালিকাভুক্ত প্রতিটি ভাষাই ভারত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা, নিজ নিজ ভাষাভাষীর মধ্যে, একে অপরের প্রতিবেশী। হিন্দিকে কোণঠাসার অর্থ জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত— এ সস্তা প্রচার নিছকই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, আসল কথা— বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'— এ কথা তো কবিগুরু কবে বলে গিয়েছেন। ভিন্ন রাজ্যের বা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা ইংরেজী হলেও রাজ্যের অভ্যন্তরে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারী কাজে বাংলার প্রয়োগ করতেই হবে। যে সমস্ত তথাকথিত উদারচেতা বাঙালি অবাঙালিদের কথা তুলে সমস্ত কাজে বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাঁরা কি এ খবর রাখেন যে অন্যান্য রাজ্যে থাকতে গেলে, কোন জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে সে রাজ্যের ভাষা জানা অবশ্যম্ভাবী। কই, তখন তো কারো হুঁশ নেই? বাংলার ক্ষেত্রেই যত তর্জনীনিক্ষেপ। আসলে নিজের ভাষা, সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে, রাজ্যের তথাকথিত জনপ্রিয় মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম কোনমতে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। রাজ্যের রাজনৈতিক বিরোধিতা করতে গিয়ে এঁরা বিরোধিতা করছেন বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে। নিজেদের প্রয়োজনে অবাঙালি শ্রমিক, কর্মচারী, আমলা সরকারি ও বেসরকারি কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের কাজ চালানোর মতো বাংলা শিখতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যে হিন্দি ভাষার একচেটিয়া মৌরসিপাট্টা নয় তা স্পষ্ট করে দেখাবার সময় এসেছে। রাজ্য সরকারের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কাজে বাংলার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রশংসনীয়। বাংলা নামে শুধু বাংলা মদ বোঝে যে কীটাণুর দল, কিছু বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ, বাংলায় কথোপকথন, বাংলার সংস্কৃতি চর্চা, বাংলা সাহিত্য, বই, কাগজ, পত্র-পত্রিকা পড়ায় যাদের বিরক্তি, তারা আত্মঘাতী বাঙালি, এরা জন্মেছে বাংলায়, বাঙালি হয়নি। এরা পশ্চিমের লোক যেখানে সূর্যাস্ত হয়, যেখানে সব কিছু ভাঙনের মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র করা হয়। আমরা সাধারণ পূবের লোক, যেখানে সূর্যোদয় হয়, নতুন ভাবে গড়া, নয়া মন্ত্র উচ্চারিত হয় মানুষের কণ্ঠে।

চর্যাপদের আমল থেকে শুরু করে এ এক মহতী আবেগ, যে আবেগে কবিগুরু নেতাজীকে বলেছিলেন 'আপনাকে বাংলার অধিনায়করূপে বরণ করছি।' সেই আবেগেই জীবনানন্দ বলে ওঠেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি...', শামসুর রহমানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে'...। বাংলা ভাষা মানেই গান, কবিতা, নাটক, কথকথা, পাঁচালী, লোকগীতি, গণসংগীত। খেদের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের প্রজন্ম বাংলা তো জানেই না, ইংরেজী ও ভালো করে জানে না। কলেজের অলিন্দে যেতে যেতে সতীর্থদের অধিকাংশের যে কথা কানে আসে তাকে এ অভাজনের বাংলা, হিন্দি ইংরেজী কোন শ্রেণীতেই ফেলতে না পেরে 'ই- বচ - ন্দি' শ্রেণীর বলে মনে হয়েছে। বাংলায় আদ্যন্ত পড়াশুনো করে ঈর্ষণীয় ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারতেন খ্যাতিমান বাঙালিরা। উদাহরণ দিতে বসলে বই হয়ে যাবে, দু-একটি দেওয়া যেতে পারে, যেমন সত্যজিৎ রায়, যেমন, অমর্ত্য কুমার সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে প্রচলিত প্রথা ভেঙে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। বাংলা ভাষার প্রতি চক্রান্ত আজকের নয়। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বই লেখা হলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ বিধান দেন, বাংলায় ধর্মগ্রন্থ পড়লে তার স্থান হবে 'রৌরব' নামে নরকে। সেই নরক বাংলা ভাষার অগ্রগতির পথকে আটকে রাখেতে পারেনি।

গোটা বিশ্বের ২১ কোটি মানুষের ভাষাকে অবজ্ঞা করা যায় না। এই সুপ্রাচীন ও সুমহান ঐতিহ্যশালী ভাষায় রচিত সাহিত্য ভূষিত হয় নোবেল পুরস্কারের সম্মানে। এই ভাষার ওপর ভিত্তিকরে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হয়। এ ভাষার সম্মান রক্ষার্থে ঢাকার রাজপথ রক্তে লাল হয়ে যায় '৫২ এর ভাষা আন্দোলনে। তামাম দুনিয়ায় কেবল এই ভাষাতেই রচিত হয় দুদুটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের ওপর যখন জোর করে উর্দু চাপিয়ে মাতৃভাষার অবমাননা করা হয়েছিল, মেনে নেননি তাঁরা। আজ এ বাংলায় শিক্ষা, অফিস, আদালত, রুজি-রোজগারের, বাড়ি ও বাজারের, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জনদের আলাপচারিতার ভাষা হিসেবে বাংলা স্বভূমে কোণঠাসা, পর্যুদস্ত। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে ঘটা করে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালন আত্মপ্রবঞ্চনা ও তঞ্চকতার সামিল।

আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি অবিলম্বে অফিস, আদালত সহ সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, উচ্চশিক্ষায়,

সর্বত্র বাংলার প্রয়োগ করব। যতদূর পারি বাংলা পরিভাষার প্রয়োগ করব, শ্রুতিমধুর পরিভাষা না পেলে প্রচলিত ইংরেজী শব্দকেই বাংলা হরফে লিখে আপাতত কাজ চালাব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করব। আমরা অন্য ভাষার বিরুদ্ধে নই, আমরা চাই সব ভাষার সমান উন্নয়ন, অগ্রগতি ও বিস্তার কিন্তু মাতৃভাষার মর্য্যাদা রক্ষার প্রশ্নে কোনরকম আপস নয়। আসুন, আমরা শপথ নিই মাতৃভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকব এবং বাংলা ভাষার উজ্জ্বল ভবিষৎকে আগামী দিনে আরো মজবুত ও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে মাতৃভাষার উন্নয়নকল্পে যে কোন কর্ম উদ্‌যাপনে দ্রুত অগ্রসর হব।

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে—
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি-চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ।"

— জীবনানন্দ দাস।

পিথো

স্বপন কুমার দাস
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

সত্তর দশকের শেষভাগ। সময়টা বর্ষার শেষ দিক। সূর্য প্রায় পাটে বসতে চলেছে। ক্লাস শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। এমন সময় জ্যোতি এসে হাজির।

জ্যোতি তখন এই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। পুরো নাম জ্যোতি পারেখ। অন্য ছাত্রের থেকে ও বরাবরই আলাদা। গাছ-পালা কিংবা জন্তু-জানোয়ার অথবা পোকামাকড়— সব কিছুতেই জ্যোতির আগ্রহ। আর জ্যোতির আসা মানেই নতুন কিছু। এর আগেও অনেকবার অদ্ভুত কিছু নমুনা নিয়ে এসেছে। বলতে-কী, জ্যোতির মুখে-চোখে সবসময়ে একটা আলো যেন ঝলমল করত।

তবে, সেদিনের চমকটা যেন একটু বেশি কড়া গোছের হয়ে উঠল। সামলে নিতে সময়ও লাগলো বেশ কিছুক্ষণ। "স্যার, একটা পাইথন পেয়েছি। একবার দেখবেন।" চমকে ওঠার মত খবরই বটে। পাইথনটা কি জ্যোতি এখানে নিয়ে এসেছে না কি? জিজ্ঞেস করে জানলাম, কয়েকদিন আগে জ্যোতি একটা ময়াল সাপ, যার অপর নাম 'পাইথন', তা জোগাড় করেছে। ময়ালটিকে জ্যোতি বাড়িতে রেখেছে। তার পরেই সমস্যার শুরু। কী খায় ময়াল? কেমন জায়গায় থাকে ওরা? ওদের স্বভাব চরিত্র বা কেমন? এই রকম একরাশ প্রশ্ন জ্যোতির মাথায় ঘুরছে। সবচেয়ে বড় কথা, এর মধ্যেই জ্যোতি ময়ালটিকে ভালবেসে ফেলেছে। এমন কি, তার একটা সুন্দর নামও রেখেছে। বেশ ছোট্ট আর মিষ্টি নাম— 'পিথো'।

জ্যোতির কাছে 'পিথোর' কথা শুনে খুব কৌতূহল হতে লাগল। আর এমন সুযোগ ছাড়ে কে? জল জ্যান্ত একটা ময়াল। একদম কাছ থেকে দেখতে পাব। ইচ্ছেমত হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব। আর ময়ালের খাবার-দাবার এবং স্বভাব চরিত্র নিয়েও কিছু তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবার সুযোগ পাব। এর আগে যে কখনও ময়াল বা অজগর সাপ দেখি নি, এমন নয়। চিড়িয়াখানায় কাঁচের ঘরে একটা বিশালদেহী ময়াল রাখা ছিল। দৈত্যাকার সাপটিকে বিশেষ নড়াচড়া করতে দেখি নি, খেতে তো নয়ই। তবে, শুনেছিলাম, দু'-সপ্তাহে একবার তাকে একটা মুরগি খেতে দেওয়া হয়। যেদিন কুমির, সাপ আর গোসাপদের খেতে দেওয়া হত, সেদিন চিড়িয়াখানার দরজা থাকত বন্ধ। কাজেই এইসব সরীসৃপ কী খায় অথবা কেমন করে খায়, তা বই পড়েই জানতে হত। এবার বোধহয় সেই আফশোস ঘুচল।

দুই

কথাটা জ্যোতিই পাড়ল। নইলে আমাকেই বলতে হত। এক ছুটির দিনের বিকেলে জ্যোতির বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। জ্যোতির বসবার ঘরে পিথো তখন বিছানার ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। নেহাতই বাচ্চা। লম্বায় বড়জোড় ৮০ সেমি। জলপাই সবুজ রংয়ের ওপর আঁকা-বাঁকা ডোরাদাগ। মাথার সামনেটা ভোঁতা। ওপরের চোয়ালে ছোট্ট একটু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে সরু আর চেরা লিক্‌লিকে জিভটা মাঝে মাঝেই বার করছিল সাপটা। চেহারা দেখে বুঝতে দেরী হল না, সেটি ময়ালের শিশুই বটে। ইংরেজিতে যার নাম 'ইণ্ডিয়ান রক পাইথন' আর ল্যাটিনে একে বলে 'পাইথন মলুরাস'।

জাত তো চেনা গেল। গোল বাঁধল খাবার নিয়ে। কী খেতে দেওয়া যায় পিথোকে। বইতে পড়েছি, ময়াল বড় বড় জন্তু জানোয়ার আর পাখি ধরে খায়। বড় চেহারার বয়স্ক ময়াল সুযোগমত একটা হরিণকেও গিলে ফেলতে পারে। আর অজগর' নামটাও বলে দিচ্ছে, একটা ছাগলকে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে এরা। সবইতো বোঝা গেল, এখন বাড়ির মধ্যে পিথোকে কী খেতে দেওয়া যায়? জ্যোতি আর আমি বেশ সমস্যায় পড়লাম। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, পিথোকে ছোটখাটো পাখি খেতে দেওয়া হবে।

এতেও ঝামেলা শেষ হলো না। ছোট খাটো চেহারার পাখি পাই কোথায়? অনেক ভাবনাচিন্তা করে ঠিক করলাম পাখিওয়ালার কাছ থেকে মুনিয়া পাখি কেনা হবে।

মুনিয়া পাখি তো জোগাড় করা গেল। কিন্তু যা দাম নিল, তাতে বেশ বোঝা গেল যে পিথোর জন্য অন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যোতিই বুদ্ধি বার করল। ঠিক হল চড়াই পাখি ধরা হবে। কিন্তু চড়াই ধরা কি সোজা কাজ?

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে সারা দুপুর ঠা-ঠা রোদ্দুরে নানা ধরণের ফাঁদ পেতে চড়াই পাখি ধরার চেষ্টা চালানো হল। এক নাগাড়ে চার-পাঁচ দিন চেষ্টা চালিয়ে একটা চড়াই ধরা সম্ভব হল। এমনভাবে চললে তো পিথো না খেয়েই মরবে। ভাগ্যিস, পিথোর খিদে খুবই কম। পনেরো দিনে একবার পেটভরে খেতে পেলেই হল।

আবার ভাবনা-চিন্তা শুরু হল। কী করা যায়? পিথোর জন্য কোন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা যায়? ময়াল তো ব্যাঙ খেতে বেশী পছন্দ করে না। অগত্যা ইঁদুরের কথাই মনে এল। জ্যোতির বাড়িতে এবং প্রতিবেশীদের বাড়িতে ইঁদুরের কোন অভাব ছিল না। খেড়ে কিংবা নেংটি— দু-জাতের ইঁদুরই ছিল প্রচুর। কিন্তু ওসব দেশী ইঁদুর তো চলবে না। পিথোর খাঁচায় ইঁদুর ছেড়ে দিলে প্রাণীটি তো চুপচাপ ময়ালের মুখে গিয়ে ঢুকবে না। খাঁচার মধ্যে ওই একটুখানি জায়গার মধ্যে ইঁদুরটা যদি পিথোকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়, তাহলে কী হবে? নেংটি ইঁদুর হলে তবু একরকম। নেংটিরা অতটা হিংস্র নয়। খেড়ে ইঁদুর হলে কিন্তু সহজে ছাড়বে না, লড়ে যাবে। তাতেই ভয় বেশি।

এরও সমাধান বেরোল। ঠিক হল সাদা ইঁদুর দেওয়া হবে। এমনিতে সাদা ইঁদুর স্বভাবে ঠাণ্ডা, শান্ত-শিষ্ট।

সাদা ইঁদুর কিনে বাড়িতে পোষা হল। আর কিছু দিনের মধ্যেই ইঁদুরের দল বাচ্চা দিতে আরম্ভ করল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি সাদা ইঁদুর পাওয়া গেল।

তিন

যেদিন প্রথম পিথোর খাঁচায় সাদা ইঁদুর ছাড়া হল, সেদিন একটা মজার কাণ্ড চোখে পড়ল। পিথো তো আগে কোনওদিন ইঁদুর দেখে নি। সে চুপচাপ পড়েই রইল। ইঁদুরটাও একটা মজার কাণ্ড করে বসল। সে দিব্যি একটুও ভয় না পেয়ে পিথোর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বোধহয় পিথোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে লাগল। প্রথমে পিথোর গা ভালো করে শুঁকতে লাগল। পিথো কোনও পাত্তা দিল না। তাই বলে ইঁদুরটার দিকে তেড়ে গেল না। আমাদের চিন্তা বেড়েই চলল। কীভাবে পিথোকে বোঝানো যায়, ইঁদুরটা তার খাদ্য। না খেলে পিথো নিজে বাঁচবে না।

অগ্যতা একটু খোঁচা খুঁচি করতে হল। বেশ কিছুক্ষণ পরে পিথো যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। তারপর বোধহয় বুঝতে পারল, ইঁদুরটা খেতে হবে। পাকে-পাকে ইঁদুরটাকে জড়িয়ে ধরল পিথো। শেষে শিকারটাকে পিছনদিক থেকে গিলতে লাগল।

এরপর থেকে পিথোকে ইঁদুর বা পাখি, যাই দেওয়া হোক না কেন, পিথো তাকে ধরে খেতে শিখে গেল। বেশ চলতে লাগল। এর মধ্যে পিথোর দিব্যি বাড়-বৃদ্ধি হয়েছে।

শীতের শুরুতে পিথো বেশ পেট ভরে ইঁদুর খেয়ে নিল। হাওয়ায় একটু শিরশিরে ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গেই পিথোর শরীরে নেমে এল আবেশ। বুঝলাম শীতঘুম বা 'হাইবারনেশানের' জন্য তৈরি হচ্ছে আমাদের পিথো। একটা ছেঁড়া কম্বল, একটা চটের বস্তা আর এক আঁটি খড় দেওয়া হল। এরই মধ্যে অবশ্য পিথোর জন্য আলাদা একটা খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জ্যোতির বাড়িতে একটা ছোট্ট চিলেকুঠুরি আছে। বহুদিন ধরেই সেটা কোনও কাজে আসত না। ঘর গেরস্থালীর নোংরা আবর্জনায় ভর্তি থাকত। ওই এক চিলতে ঘরটুকুকে একটু গুছিয়ে নেওয়া হল। সামনে বসানো হল তারের জাল দেওয়া একটা দরজা। দিব্যি খাঁচা তৈরি হয়ে গেল। পিথোকে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা হল। চিড়িয়াখানায় দেখেছিলাম ময়ালের খাঁচায় শুকনো গাছের ডাল আর জলের পাত্র দেওয়া হয়। পিথোর জন্যেও যথাযথ ব্যবস্থা করা হল।

ওই খাঁচার মধ্যেই বেশ আয়েস করে পিথো শীতঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শীতের ক'মাস ওই ভাবেই কাটিয়ে দিল

পিথো। শীত পেরিয়ে বসন্ত এসে পড়ল। গায়ে আর সোয়েটার রাখা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই পিথোর খাঁচায় উঁকি মেরে দেখি। প্রতিবারই ভাবি, পিথোর ঘুম বুঝি ভাঙ্গল। পিথোর ঘুম কিন্তু ভাঙ্গে না। চিড়িয়াখানায় একদিন ঢুঁ মারলাম। না, সরীসৃপ ভবনের খাঁচার বাসিন্দারা একে একে ঘুম ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। পিথোর বিছানা যেমনকে তেমন। আমাদের উদ্বেগ বেড়েই চলে। দিন গুনতে থাকি, এই বুঝি শ্রীমান পিথো আলিস্যি ভেঙ্গে জেগে উঠল। কিন্তু কোথায় কী? দীর্ঘ প্রতীক্ষা ক্রমশ ভয়ের চেহারা নিতে শুরু করে। তবে কি পিথো চিরদিনের মতই ঘুমিয়ে পড়ল? আর কোনও দিন কি পিথোর ঘুম ভাঙ্গবে না?

একদিন সকালে অবশ্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ হল। খুব আস্তে আস্তে বিছানার তলা থেকে মুখ বাড়ালো পিথো। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে ওর। গায়ের চামড়া কেমন যেন শুকনো আর ফাটা-ফাটা। দু-এক দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল। আর কিছু নয়, খোলস ছাড়ছে। প্রথমে গায়ের ওপরের চামড়ায় ফাটল দেখা দিল। তার মধ্যে দিয়ে পিথো নড়ে-চড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

তার পরেই আবার সমস্যা। পিথো খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে দিল। পিথোকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বোঝা গেল, ওর শরীরে ভিটামিনের অভাব হয়েছে। ওর দরকার ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স-এর মত ওষুধ। বোঝা তো গেল, পিথোকে ওষুধ খাওয়ানো যায় কীভাবে?

জানা ছিল, কোনও জীবন্ত শিকার ছাড়া সাপ কিছু খায় না। শুধু তাই নয়, জীবজন্তু নড়াচড়া না করে চুপচাপ পড়ে থাকলে সাপ তাকে ধরে না। কাজেই পিথোকে ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়াবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে ওর শরীরে ভিটামিনের অভাব পূরণ করা যায় কীকরে? অগত্যা আবার বহু চেষ্টা-চরিত্র করে একটা চড়াই পাখি ধরা হল। পাখিটাকে একটা ভিটামিন ক্যাপসুল গিলিয়ে দেওয়া হল। ঝিমিয়ে পড়ল পাখিটা। অযথা কালক্ষেপ না করে পাখিটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল পিথোর খাঁচায়। পিথো ততদিনে বুঝে ফেলেছে, জীবন্ত পাখি আর ইঁদুর পেলে তাকে ধরে খেতে হয়। সেইসঙ্গে অবশ্য একটা ক্যাপসুল ভেঙ্গে তার ভেতরের বস্তু খাবার জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাজ হল। গুটিকয় 'ভিটামিন পাখি' পিথোকে খাওয়ানোর পর সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

চার

বেশ চলছিল। খাঁচার মধ্যে বন্দি জীবনে পিথো বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। খাওয়া দাওয়া নিয়ে তার বায়নাক্কাও ইদানিং বড় একটা দেখা যাচ্ছিল না। এরমধ্যে পিথো নিয়মিত খোলস ছেড়েছে আর লম্বা চওড়ায় বেশ বেড়েছে। বছর দেড়েক বাদে একটা সুপারি গাছের গুঁড়ির সমান। গায়ে-গতরে বাড়ার পর আমরা বড় একটা ওর কাছে ঘেঁষতাম না। পিথোও আমাদের সঙ্গ পছন্দ করছিল না। ওর খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ও কুণ্ডলীর পাক খানিকটা খুলে বেশ জোরে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ করত।

পিথোর কথা জানাজানি হতে বিশেষ সময় লাগে নি। চারদিকে পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে বেশ সোরগোলও পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই বলতে আরম্ভ করেছিলেন, পিথোকে বাড়িতে না রাখাই ভালো। কেউ বললেন, সরকারি বন-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, আবার কেউ বললেন চিড়িয়াখানায় ওকে পাঠিয়ে দিতে। কোনও শুভাকাঙ্খী বন্ধু আবার পরামর্শ দিলেন, কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি-চুপি রাতের বেলায় দূরে কোনও জঙ্গলে গিয়ে পিথোকে ছেড়ে দিতে। যে যাই বলুক, পিথোকে ছেড়ে দিতে আমাদের মন সায় দিচ্ছিল না। মুশকিল হল, সবাই তো আর আমাদের মত নয়। কাছাকাছি একটি বাড়িতে পোষা ময়াল রয়েছে তা জেনে কেই-বা রাত্তিরে দু-চোখের পাতা এক করতে পারে?

পাঁচ

মনে আছে, গরমের দিন ছিল সেটা। খুব সকালে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছি, এমন সময়ে জ্যোতিহন্তদন্ত হয়ে হাজির। চুল এলোমেলো, একমুখ দাড়ি আর জামাকাপড়ের অবস্থা না বলাই ভালো। ওকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেছে। প্রথমেই মনে হল, বাড়িতে কোনও বিপদ ঘটেনি তো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে

হলো না। মুখ খুলল জ্যোতি। "পিথোকে পাওয়া যাচ্ছে না।" এটুকু বলেই জ্যোতি দু-হাতের পাতায় মুখ ঢাকল। ওই কটা কথায় আমিও লাফিয়ে উঠলাম। রইল পড়ে চা আর কাগজ। দৌড়লাম জ্যোতির সঙ্গে ওর বাড়িতে। তারপর চলল আঁতি-পাতি করে খোঁজার পালা। না, কোথাও চিহ্ন নেই। অতবড়, মোটাসোটা ময়াল সাপটা গেল কোথায়?

কীভাবে যে পিথো খাঁচা থেকে বাইরে এল সেটা বুঝতে অবশ্য বেশিক্ষণ সময় গেল না। চিলেকুঠরিতে কে উঠেছিল, তা বোঝা গেল না। তবে, যেই উঠুক না কেন, খাঁচা সেই খুলেছিল। তারপর বোধ হয় পিথোর 'ফোঁসফোঁস' শুনে ভয়ে পেয়ে যায়। যাবার সময়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে কিংবা ভয়ের চোটে চম্পট দিয়ে থাকবে। এর আগেও দু-একবার জ্যোতির বাড়িতে ছিঁচকে চুরি হয়েছে। এত জিনিস থাকতে শ্রীমান চোরের হঠাৎ পিথোর দিকে নজর গেল কেন, তা কিন্তু আমাদের মাথায় ঢুকল না।

দিন গোনার পালা শুরু হল। দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দেখতে দেখতে তিন মাস কাটল। কোথাও পিথোর কোনও চিহ্ন নেই। কোথায় গেল পিথো। অতবড় একটা ময়াল। লোক দেখতে পেলেই তো ঠেঙিয়ে মারবে। আর তাও যদি হয়, তাহলে ওর শরীরটা পড়ে থাকবে। লোকজনের মুখেও তো গল্পটা শোনা যাবে।

এর মধ্যে অবশ্য পিথোর হাল-হদিস জানতে চেষ্টা কম করা হয় নি। পিথো ইঁদুরের গন্ধটা খুব ভালভাবেই চিনতে শিখেছিল। একবার আমাদের মনে হল, যদি পিথো "রেন ওয়াটার পাইপে" গিয়ে ঢোকে। একটা ইঁদুরকে দড়ি বেঁধে পাইপের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কোথায় কী? পিথোর লেজটুকুর ছায়াও চোখে পড়ল না।

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম, পিথো অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দূরে কোথাও সরে পড়েছে। আর সম্ভবত সে আর বেঁচে নেই।

আবার একদিন বিকেলে জ্যোতির ফোন পেলাম। খবর শুনে প্রায় আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। পিথোকে খুঁজে পাওয়া গেছে। জ্যোতির বাড়ি গিয়ে পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝা গেল। কোনও রকমে পিথো পাশের বাড়িতে ঢুকেছিল। বহুদিন ধরেই ওটা বন্ধ হয়ে পড়েছিল।

সেখানকার একটা ভাঙ্গা আলমারির মধ্যে ডেরা বেঁধেছিল পিথো। অবশ্য গেরস্থের উপকারও করেছে সে। গুদামের যত ইঁদুর ছিল সবগুলোকে ধরে খেয়েছে পিথো। আর এরমধ্যে একবার খোলসও ছেড়েছে।

এই ঘটনার পর আর পিথোকে আমাদের কাছে রাখতে ভরসা হয় নি। চিড়িয়াখানার কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানেই ওকে পাঠানো হল।

অন্যসব ময়ালের সঙ্গে দিব্যি মিশে গেল পিথো। আমি আর জ্যোতি অনেকবার চিড়িয়াখানায় গেছি। পিথোকে খোঁজার চেষ্টাও করেছি। আটটা ময়ালের মধ্যে ওকে আলাদা করতে পারি নি। আর পিথো? হায়রে, ওদের কোনও স্মৃতি নেই।

সব পাখি ঘরে আসে
সব নদী ফুরায়, শেষ হয় জীবনের সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার
বনলতা সেন

— জীবনানন্দ দাস।

হয়তো কাকতালীয়

সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত
অধ্যাপিকা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

পল্লব আর কৌস্তভ নাছোড়বান্দা। কিছু একটা লিখে দিতে হবে। আজকাল তোমাদের জন্য কিছু লিখতে গেলে, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা লেখা হয়ে যায় — তোমরা ভালো হও, মানুষ হও। শুনতে শুনতে তোমরা নিশ্চয় ক্লান্ত। ওদের বক্তব্য — তাই লিখে দিন। না, এবার আর ওসব কথা লিখছি না। একটু অন্য কথা লিখব। ছাত্রজীবনের একটা অদ্ভুদ অভিজ্ঞতার কথা লিখব, যে অনুভূতির বিশ্লেষণ আমি আজও করে চলেছি।

গবেষণা করবার জন্য তিনবন্ধু অধ্যাপকের ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছি। এখনকার তুলনায় সে সময় আমাদের স্কলারশিপের হার ছিল খুবই কম। টাকা পয়সার অভাব থাকলেও যে জিনিসটার অভাব তখন ছিলনা— তা হোল উৎসাহের আর স্বপ্নের।

আমাদের কাজ ছিল উচ্চতায় বসবাসকারী এক বিশেষ প্রজাতির পতঙ্গের সুলুকসন্ধান করা। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে তাদের গতিবিধি লিপিবদ্ধ করা। এর জন্য স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল 'যোশীমঠ' ও তার কাছাকাছি কিছু অঞ্চল। যোশীমঠ সে অর্থে আমাদের 'বেস ক্যাম্প'। শান্তনু আর অশোক প্রতিবার যাবে। ওদের আনা 'ডেটা' বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব আমার। তবে বছরে একবার অন্তত আমাকে ওদের সঙ্গে পাহাড়ে যেতে হবে। ওরা দুবার ঘুরে আসার পর তৃতীয়বারের যাত্রায় ওদের সঙ্গী হলাম আমি আর আমাদের ল্যাবরেটরীতে যে ছেলেটি হাতে হাতে সব কাজে সাহায্য করে, সেই নীতু। সময়টা অক্টোবরের শুরু। শরৎকালের গাড়োয়াল। যারা ঐ সময় গেছে তাদের আর নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার কাছে সেটা ছিল এক অভিনব অভিজ্ঞতা। হৃষিকেশ হয়ে যোশীমঠ পৌছলাম দ্বাদশীর দিন। গ্রামে একজনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা। শান্তনু আর অশোকের সঙ্গে ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকের পরিচিতি হয়ে গেছে। পরের পর দিন আরও উপরের দিকে যাত্রা—"ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স" বা "ফুলো কী ঘাঁটি" তে। সেই যাত্রা থেকে বাদ পড়লাম আমি। যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে থাকবার কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা পাওয়া যায়নি আর ঠান্ডায় আমি একটু কাবু হয়ে পড়েছিলাম। যোশীমঠে আমি আর নীতু থেকে গেলাম।

ওরা রওনা হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের কয়েকজন কত্তা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হোল। কথায় কথায় জানলাম, প্রতি পূর্ণিমার রাতে এক অভিনব দৃশ্য দেখা যায় এই যোশীমঠ থেকে। দূ-রে নন্দাদেবীর চূড়ার ফাঁকে এক বিশালাকার মানব অবয়ব যেন এগিয়ে চলে। আর তার পিছনে চলে সারি সারি ভেড়ার পাল। অনেকক্ষণ ধরে নাকি এই দৃশ্য বিদ্যমান থাকে। ঠিক করলাম, মাঝরাতে উঠে আমাকে দেখতেই হবে এহেন অভূতপূর্ব দৃশ্য। উঠে ছিলাম। পরের দিন সকালে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলাম না। যা দেখেছি তা কি সত্যি নাকি আমার চোখের ভুল। নাকি ওটা ছিল পাহাড়ের আড়ালে শুধু কিছু মেঘের আনাগোনা।

পরদিন বিকেলে ওরা ফিরল। সংগ্রহ করে আনা পতঙ্গের নমুনাগুলো লিপিবদ্ধ করে, গুছিয়ে রেখে, চারজন বের হলাম চা খেতে। সামনে 'দীপক পাকোড়েওয়ালা'র দোকানে চা খেতে খেতে শুনছিলাম ওদের অভিজ্ঞতার কথা। ওরা গোবিন্দঘাট আর ঘাংঘরিয়া হয়ে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সে পৌছেছিল পূর্ণিমার দিন সকালে। সারাদিনের কাজ সেরে, বিকেলে যে আশ্রয় ওদের জুটেছিল, তা হলো জীর্ণ মন্দির। একজন পাহাড়ী নীচের একটা গ্রাম থেকে এসে পুজো সেরে বিকেলের আগেই আবার গ্রামে ফিরে যায়। ঐ ব্যক্তির মুখে ওরা শুনেছিল— কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে এই ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স বা শান্তনুর ভাষায় ভ্যালি অফ কালার্স এ কারা যেন ঘুরে বেড়ায়, ভেসে আসে মধুর সঙ্গীতের সুর। এহেন বিবৃতি ওরা যোশীমঠে থাকতেই শুনেছিল আর সেইজন্য সব রকম কষ্ট উপেক্ষা করে এবার কোজাগরী পূর্ণিমায় ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স এ রাত কাটানোর পরিকল্পনা, সন্ধ্যে থাকতে থাকতেই ওরা আপেল আর আলুসেদ্ধ সহযোগে

ডিনার সেরে, একটায় ওঠার জন্য ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে, মোমবাতি নিভিয়ে, যে যার স্লিপার ব্যাগে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। শান্তনুর যখন ঘুম ভাঙে— ঘড়িতে তখন সোয়া দু'টো, এলার্ম বাজেনি। দুজনে ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখি— জ্যোৎস্নায় স্নান করছে ভ্যালি। সকালের সেই সব রঙবেরঙের হাজার হাজার ফুলগুলোর গায়ে এখন শুধু জ্যোৎস্নার রং। তবে কিছু যেন একটা ঘটে গেছে। কোথাও গোছা গোছা ফুল নুয়ে পড়েছে, কোথাও বা ফুটেছে নতুন ফুলের থোকা, জায়গায় জায়গায় গাছের পাতা স্তূপাকৃত হয়ে ঝরে পড়েছে, বাতাসে ম-ম করছে সুন্দর আঘ্রাণ। ওদের বক্তব্য— পূর্ণিমার রাতে প্রকৃতির নিশ্চয় এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে, যার জন্য গাছের ফুল ফোটানোর বা পাতা ঝরানোর এক নতুন ছন্দের সৃষ্টি হয়। তবুও ওদের দুজনের গলায় শুনতে পেলাম একটা সুযোগ হারানোর প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাস।

পরের দিন সকালে কাছাকাছি অ্যালপাইন বনে আমাদের পতঙ্গ সংগ্রহ। সাতসকালে উঠে, জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সারাদিন নমুনা সংগ্রহ, ছবি তোলা, তথ্য নথিভুক্ত করা। খাবার বলতে— বাজরার রুটি, সামান্য সব্জি, আপেল আর ফ্লাস্কে চা। বিকেল হয়ে আসছে। গ্রামে ফিরতে হবে। এবার হোল মুস্কিল। কিছুতেই ফেরার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। বারবার একই রাস্তায় ফিরে আসছি। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের পরিশ্রমের পর বড় রাস্তাটা পাওয়া গেল। ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে দীপকের দোকানে ঢুকলাম চা খেতে। আমাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করছিলাম। দীপক অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইল যে গাড়োয়ালের বনে জঙ্গলে ঘুরতে গেলে কয়েকটা যে নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় গ্রামের কেউ কেন সেকথা আমাদের বলে দেয়নি! নিয়মকটা মেনে চললে জঙ্গলে কোন ভয় নেই। এই যেমন জঙ্গলের মধ্যে চামড়ার কোন জিনিষ ব্যবহার করা চলবে না। দীপকের বক্তব্য, অশোকের পরনের চামড়ার জ্যাকেটটাই নাকি পথ হারানোর কারণ। পরের দিন আবার একই গন্তব্য। রওনা হবার একটু পরেই অশোক হঠাৎ "আজ তেমন নেই— বল?" বলেই চামড়ার জ্যাকেটটা খুলে দীপকের দোকানে রেখে এলো। বেশ উপভোগ করলাম ব্যাপারটা। এবার যাওয়ার পথে নীতু বুদ্ধি করে রাস্তার ধারের গাছের গুঁড়িতে কিছু কিছু এঁকে দিতে লাগলো। সারাদিন কাজের পর ফেরার পালা । কিন্তু আজ আবার সেই ফ্যাসাদ। চিহ্ন করা গাছগুলো খুঁজে পাচ্ছি, বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। একই রাস্তায় বারবার ঘুরছি, এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। অবশেষে অনেক কষ্ট করে বড় রাস্তাটা দেখা গেল কিন্তু কিছুতেই বড় রাস্তাটায় পৌঁছাতে পারছি না। দিশেহারা এই অবস্থায় ভাগ্য সামান্য প্রসন্ন হোল। জঙ্গলের মধ্য থেকে এক পাহাড়ী কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল। তার সাহায্য চাওয়ায়, সে আমাদের তার পিছন পিছন যেতে বললো। মূহুর্তের মধ্যে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যে কোথায় গেল। উবে গেল নাকি। যাকগে আমরা তো পৌঁছে গেছি। রুটিন মাফিক চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। শান্তনু হঠাৎ গোবেচারা মুখ করে বললো, যে তার স্নিকার্স কড়ে আঙুলের কাছে ফুটো হয়ে গিয়েছিল দেখে ও আজ সকালেই মুচিকে দিয়ে জুতো সারাই করেছে। কাপড়ের জুতোয় চামড়ার তাপ্পি দিতে বারণ করেছিল। মুচি বেচারার কাছে আর কিছু না থাকায় আর শান্তনুর খুব তাড়া থাকায়, বড় বড় দুটো চামড়ার তাপ্পিই লাগিয়ে দিয়েছিল। আজকের বিপত্তির কারণ কি তাহলে.... ?.... ?.... ?

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি।"

— জীবনানন্দ দাস।

"লাল মাটির দেশে"

তপন পোদ্দার
শিক্ষাকর্মী

পড়াশুনা, খেলাধূলা, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা এমনকি জীবনযুদ্ধের প্রতি মূহুর্তে চ্যালেঞ্জ। ৩৬৫ দিনই এই চ্যালেঞ্জ আমাদের নতুন নতুন ধারায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু এই একঘেঁয়েমি জীবনের থেকে কয়েকটি দিনের জন্য বিশ্রাম প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাই বিশ্বভূখন্ডের বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করা এবং জীবনের নতুনত্বের তাগিদে বেড়িয়ে পড়ার দরকার। অভাব, দারিদ্র্য আমাদের দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের নিত্যসঙ্গী। তবুও হাজার হাজার মানুষ সবকিছুকে উপেক্ষা করে বেড়িয়ে পড়েন নতুনের সন্ধানে।

"আমাদের দেশ ভারতবর্ষ মোটেই গরীব দেশ নয়।" প্রাকৃতিক সম্ভারে ভরা "নানা ভাষা নানা মত নানাপরিধানে।" কতকি দেখার, কতকি জানার, কতকি শেখার। দেশের একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে সমতল আবার পৃথিবীর বৃহত্তম শৃঙ্গমালা হিমালয়। তিন সাগরের মিলনতীর্থ এই ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত। এদেশে আছে মধ্যভাগে মরুভূমি, আছে গহন অরণ্য ও হিমালয়ের অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য। তাই শত শত বাধাকে অতিক্রম করে প্রতিবছরই হাজারো লাখো মানুষ বেড়িয়ে পড়েন। সারা বছর ধরেই মানুষ চলেছেন একটু বিনোদোনের আশায়। কিন্তু মাঝে মধ্যেই বাঁধ সাধেন প্রকৃতি। আবার রাজনৈতিক অথবা বিচ্ছিনতাবাদী সন্ত্রাস এই আনন্দটুকু বন্ধ করে দেয়। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সাতটি রাজ্য আছে সেখানে তারা সৌন্দর্য্যের ডালি সাজিয়ে উপেক্ষিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। এরই মধ্যে যখন কিছু মানুষ চলেছেন সেখানে তখন উগ্র সন্ত্রাসবাদীদের করালগ্রাস মানুষের যাত্রা ভঙ্গ করছে। দেশের কেন-পৃথিবীর ভ্রমণপিপাসু জনতার আদালতে সর্বজন স্বীকৃত ভূস্বর্গ কাশ্মীর হলো সপ্তম আশ্চর্যের একটি। রূপসী মোনলিসা যেখানে হার মানে সেই ভূস্বর্গ আজ অগ্নিগর্ভা। দূরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক কারণে ভারতের প্রকৃতি প্রেমিক জনতা আজ ভীষণ ভাবে বঞ্চিত। গোটা হিমালয়ান অঞ্চলটাকেই আজ কলুষিত করছে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। প্রকৃতির এই বিশাল সম্ভারে পৌছানোর মত উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরী হয়নি ৫৩ বছরের স্বাধীনদেশে। সুপরিচিত স্থানগুলিতেই মানুষের ভিড়। আবার শান্ত স্নিগ্ধ অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভরা স্থানে মানুষের পদচারণা কম এমনি একটি অঞ্চল হলো আর্কুভ্যালি। কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে নয় এই আর্কু। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থানকারী চিরপরিচিত বিশাখাপত্তনমে নেমে যেতে হবে। অনবদ্য অপরূপ রেল যাত্রা পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ বানিয়ে কত পরিশ্রমের ফসল কিরণডোল এক্সপ্রেস প্রতিদিন ছুটছে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর পর্যন্ত। যারা আসামের লামডিং থেকে ত্রিপুরার ধর্মনগর গিয়েছেন অথবা কালকা থেকে সিমলা গিয়েছেন অথবা পশ্চিমে পুনেতেগিয়েছেন তাদের অবশ্যই পাহাড়ের সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে রেলে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। ছোট ছোট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ বিশাল, একটি ট্রেন প্রতিদিন সকালে বিশাখাপত্তনম ছেড়ে চলেছে।

আমরা কিন্তু চলেছি আর্কু ছাড়িয়ে আরো ছয় ঘন্টা পথ মধ্যপ্রদেশের সন্ধানপুর সারা রাত্রি অর্দ্ধনিদ্রায় থাকা কারণ মাঝপথে খুব ভোরের সকালে আমাদের নামতে হবে বিশাখাপত্তনম বা ওয়ালটেয়ার। আজ বিশাখাপত্তনমে বিশ্রাম নিতে হবে। বঙ্গোপসাগর পাড়ে বিশ্রাম, নয়নাভিরাম সমুদ্র দেখতে দেখতে রাত্রিবাস। পরের দিন সুপ্রভাতের অনেক আগেই আমাদের দলপতির গর্জন, আমাদের আরাম কেদারা ছেড়ে উঠতে হলো কারণ সকাল সাড়ে ছটায় কিরণডোল এক্সপ্রেস ধরতে হবে। সাত সকালেই স্নান সেরে নিতে হলো। লম্বা ট্রেন যাত্রায় আজ মাঝপথে সেই কিরণডোল এক্সপ্রেস চেপে আমরা চলেছি প্রথমে জগদলপুর। সীমাচলম একটি প্রসিদ্ধ স্থান, সেই ষ্টেশন ছেড়ে অল্প কিছু পর শুরু হলো পাহাড়ের কোল ধরে এঁকে বেঁকে সর্পিল দেহের মতো বেশ গতিতে ট্রেনটি হঠাৎ অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। চারিদিকে পাহাড়ী ঘনঅরণ্যে বেষ্টিত পথশোভা সবার মন কেড়ে নিচ্ছে। তাই তো চলন্ত ট্রেন থেকেই প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য্য ক্যামেরা বন্দী করছে যে যেরকমভাবে পারছে। এই পথে তিনটি রাজ্য অতিক্রম করতে হলো, ওড়িশা, অন্ধ্রএবং মধ্যপ্রদেশ।

প্রখ্যাত শ্রীকাকুলাম, কোরাপুট, জেজুর প্রমুখ। জগদলপুর পৌছোলাম রাত্রি সাতটা নাগাদ। ভারতের বৃহত্তম জেলা বস্তারের সদর শহর জগদলপুর ১৮২৪ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। বাঙালি মানুষের বসবাস এখানে উল্লেখযোগ্য। খুবই কাছে দন্ডকারণ্য অঞ্চল। দীর্ঘ ১২-১৪ ঘন্টা ট্রেন যাত্রায় যেমন আছে রোমাঞ্চ তেমনি নয়নজুড়ানো দৃশ্য। তখন স্বাভাবিক কারণেই মনে পড়ে "এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো।" ভালো একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। এখানে বাংলায় কথা বলার লোক পাওয়া গেলো। অমাবস্যার নিশুতিরাতে জগদলপুর পাহাড়ী শহরে পাঁয়ে হেঁটে অনেকটাই দেখা হলো। প্রথম রজনীতেই খাওয়ার প্রচণ্ড অসুবিধা হলো। বড় সমস্যা হলো তরকা কিভাবে তৈরী হবে, তা নিয়ে আমরা পনের-ষোল জন একঘন্টা সময় ব্যয় করেও বোঝাতে পারলাম না। উপজাতি মানুষ হওয়ায় হিন্দি ভালো বলতে পারে না বা বুঝতে পারে না। ফলে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্যময় বিশেষ খাওয়া সাঙ্গ হলো। সারাদিনের ক্লান্তি ও মনোরোম প্রাকৃতিক দৃশ্যকে স্মৃতির মনি কোটায় সযত্নে রেখে বিশ্রাম নেবার পালা।

পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গলো কারণ আগের রাতেই হোটেলের ম্যানেজারকে বলা ছিল যে আমরা আগামীকাল এইদৃশ্য দেখতে যাবো তাই সে দুটো গাড়ি ঠিক করে রাখেন। কিন্তু আকাশপানে চেয়ে দেখি,"এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার।" সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে রয়েছে। তখন আবার মনে হলো "আসুক তুফান আসুক না ঝড় বারি" কোন কিছুতে আমরা যেন না হারি। সাত সকালেই জানতে পারলাম আমাদের গাড়ি ঠিক হয়নি তবু আমরা একটু হেঁটে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এসে সেখানেই দুটো গাড়ি ঠিক করে সারা দিনের জন্য বুকিং করলাম। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল প্রথমে চিত্রকোট জলপ্রপাত। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার পথে শোভা অবর্ণনীয় তাই "পথের ক্লান্তি ভুলে" চিত্রকোট পৌছলাম। বর্ষায় এর অভিনব রূপ অবশ্য এই ফেব্রুয়ারীতে নেই তবুও যেটা দেখতে পেলাম তার বর্ণনা ভাষায় বলা খুব কঠিন। ১৭২২ ফুট থেকে ১৬২৬ ফুট উঁচু থেকে ৯৬.৩২ ফুট নিচে অঝরে পড়ছে জলধারা। এর মতো আর "মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকো না" বলে মনে হতে থাকে। সকালের কালো মেঘ আর নেই রৌদ্রউজ্জ্বল বেলীতে আমাদের অনেক মনের আনন্দে স্নান করলো, তবে স্নান করা নিরাপদ নয়। নিচুতে জল পড়ে সেটা ইন্দ্রাবতী নদীর সৃষ্টি করেছে এবং অবশেষে কিছু দূরে গোদাবরীতে মিশেছে এই জলপ্রপাতের জল। বহু সময় ব্যয় করে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখা সাঙ্গকরে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে "এবার তাহলে আমি যাই" বলতে বলতে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ ও মনের মনি কোঠায় বেঁধে নিয়ে ফিরে এলাম।

আবার আমাদের গাড়ি ছুটল এবার কাঙ্গেরভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। বন জঙ্গলে আবিষ্ট পার্কে বন্যজন্তুদের হানা অসম্ভব নয় কিন্তু আমাদের তার মুখোমুখি হতে হয় নি। এই পার্কে অল্প সময়ে এবার আমরা পার্কের ভিতরদিয়েই কুটুমসর গুহা অভিমুখে এগিয়ে চললাম। কপিকলের সাহায্যে ৫০ ফুট নামতে হলো। ঘন অন্ধকার, তাই "আমার গা ছম্ ছম্ করে"। তখন টর্চএর সাহায্যে দেড় কিলো মিটার এই গুহায় ঘুরে দেখা হলো। এর ভিতরে দন্ডরূপী শিবলিঙ্গ তৈরী হয়েছে। গুহার ভিতরে এক এক জায়গায় এক এক রকমের আবহাওয়া। রহস্যঘন পরিবেশে খুব বেশী সময় নেওয়া সম্ভব নয়, তাই আবার পথ চলা শুরু। এবার আমাদের উৎসস্থল তিড়ৎগড় জলপ্রপাত দেখতে। এখানে আসতে আসতে দুপুর পেরিয়ে বিকেল। পাহাড়ী জঙ্গল এলাকা সারা দিন কেটে যাওয়ার পর ২১৪ সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে যাওয়ার মুখে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান হনুমানজিদের দক্ষিণা দেবার পালা। এদের সবাইকে সন্তুষ্ট করে যখন আমরা নামছি তখন জলপ্রপাতের অনন্যরূপ দেখে মূহুর্তের জন্য যেন অন্যজগতে চলে যেতে হয়। এই ধরনের দৃশ্য সাধারণত রূপালি পর্দায় দেখা যায়। জলপ্রপাতটি দেখে মনে হচ্ছে যেন, "শিল্পীর ইজেলে লগ্ন হয়ে আছে"। প্রকৃতির কি অপরূপ সৃষ্টি সফেন জলাধারটি। বেশীক্ষণ থাকার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই কারণ বেলা যে যায় যায়, তার উপর বন্যজন্তুদের আক্রমণ হতে পারে। ছবি তোলা গেলো না আলোর স্বল্পতার জন্য তাই স্বাক্ষী রেখে চলে এলাম "স্বাক্ষী থাকুক ঝরাপাতা আকাশ বাতাস"। সারা দিনের এই অপূর্ব প্রেমের কাহিনী তো লিখে শেষ করা যায় না। তাই "মনের গভীরে শুধু আলো হয়ে থাক"।

জগদলপুরকে পরের দিন সকালে বিদায় জানিয়ে বাইলাডিলা খনি ও কিরণডোল এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি বাকি রেখেই আবার ট্রেনে চেপে চললাম। এবার এক অল্প পরিচিত কিছুটা জানা কিছুটা শোনার অঞ্চলে আর্কুভ্যালির দিকে।

ভ্যালির কথা শুনলে মনে পড়ে কাশ্মীর উপত্যকা বা কুলুর মতো নামজাদাদের। সারাদিনের ট্রেনের ধকল সামলে অবশেষে অল্প পরিচিত আর্কুভ্যালি এসে পৌছলাম। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এসে বাসে চেপে এক কিলোমিটার দূরে শহরে এসে পড়লাম। ছোট্ট ছিমছাম ভ্যালি অধিকরাত পর্যন্ত মানুষের আনা গোনা কম। দক্ষিণী চিত্রতারকাদের পদধূলীতে ধন্য এই শহর। আমরা যখন এসে পড়লাম তখন একটি ছবির শ্যুটিং চলছে, তাই হোটেল পেতে একটু বেগ পেতে হলো। অল্প বিস্তর থাকার জায়গা, এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি এখানকার পর্যটন দপ্তর, তবে ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। ১১৬৬ মিটার উচ্চতায় এই ভ্যালিতে এসে অবাক হতেই হয়। ভোর আকাশ আরো মধুর কুয়াশাঘন শান্তনীড়ে বসে থাকার উপায় নেই। পায়ে হেঁটেই শহরটাকে ঘুরে নেওয়া যায়, তখন গান গাওয়া "পথের ক্লান্তি ভুলে," "কতদিন দেখিনি তোমায় শুধু মনে পড়ে তব মুখ খানি" গান গেয়ে মনে পড়ে কাশ্মীর ভ্যালি কথা। তুলনা নিশ্চয়ই করা যাবে না তবে অপরূপ সৃষ্টির জন্য আবিষ্কারকদের ধন্যবাদ। হাঁটা ছাড়াও সাইকেল ভাড়া নেওয়া যায় এখানে। ৫টি উপত্যকার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আর্কু। আর বোন্দা, মারিস, মুরিয়া সহ ১৯টি উপজাতির বাস এই অঞ্চলে। দারিদ্র্য ভারতের অন্যান্য উপজাতিদের থেকে ব্যতিক্রম নয়। গাড়ি ভাড়া করে পর দিন সকালে চললাম এশিয়ার অন্যতম এবং ভারতের বৃহত্তম গুহা দেখার জন্য। ৩৩ কিলোমিটার দূরে বোরাণ্ডহালু বা বড়া কেভ। প্রায় ১০ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই গুহাটির আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। জাপানী একটি দল প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিলো। বর্তমানে রাজ্য সরকার গুহাটির ভিতরে রঙিন আলোর সু-সজ্জিত করেছেন। গুহার প্রবেশদ্বারটি কোন তৈরী করা নয়। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের ফলে দুটি পাহাড় হেলে যায় এবং এই গুহাটি তৈরী হয় গুহার ভিতরে প্রবেশ মূল্য দরকার। তবে মূল্যটা যাই হোক গুহায় প্রবেশের পর তার মূল্য কোন ভাবে মাপা যায় না। অনবরত চুনা ও সালফার জাতীয় দ্রবণমিশ্রিত জল পড়ে বিভিন্ন মূর্তির আকার ধারন করেছে। প্রকৃতির নিজস্বতায় তৈরী এই গুহার মাঝপ্রান্তে গেলেই বোঝা যায় যে দুটো পাহাড় একে অপরকে জড়াজড়ি করে রয়েছে। গুহার ভেতরে কোথাও প্রচণ্ড হাওয়া, কোথাও ঠাণ্ডা কোথাও বা সালফার জাতীয় পদার্থে গন্ধ। এখানকার মানুষের শ্রুতি আছে যে রামলক্ষণ সীতার বনবাসকালে নাকি এই গুহার ভিতরে অবস্থান করেছিলেন। ৭০ এর দশকে আবিষ্কৃত এই গুহাটির আকর্ষণ আরো বেড়ে যাবে যদি আর্কুভ্যালিতে আরো পর্যাপ্ত থাকার ব্যবস্থা থাকে। এবার পরের দিন বিদায় নেবার পালা। ফিরতে হবে বিশাখাপত্তনম, তারপর কলকাতা।

তাই বিদায় লগ্ন যত এগিয়ে আসছে ততই মনে পড়ছে জগদলপুরের চিত্রকোট, তিরংগড় আর্কুর জাদুঘর, বড়াকেভ, সামগ্রিকভাবে লাল মাটির দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা। ছাড়তে মন চায় না, 'তবু মনে পড়ে তব মুখ খানি'

কত দিন দেখিনি তেমায়।
তাই
আবার হবে গো দেখা
এই দেখাই শেষ দেখা নয় তো....।

"পৃথিবীর সব রঙে নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে-আসে— সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;

— জীবনানন্দ দাস।

'বার্নাড ওপারোনাজি আমায় মুগ্ধ করেছিল'

ফিরে দেখা, কিছু না বলা কথা

প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক কণিষ্ক রায়চৌধুরির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ঃ আমরা প্রত্যেকেই আজ খুব আনন্দিত। কলেজ চার দশক বাদে ইউনিভার্সিটি খেলায় (হেরম্ব মৈত্র শিল্ড) জিতেছে। একটা সময়ে কলেজে খেলাধূলোর মান পড়ে গেছিল। তারপর তোমার নেতৃত্বে একটা পরিবর্তন আসে আর আজকে আমরা ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ান। পরিবর্তনের ইতিহাস — ব্যর্থতা থেকে আজকের সাফল্যের আসার কথাটা আমরা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

কণিষ্ক ঃ প্রথমে একটা কথা। পরিবর্তন এসেছে সবার সাহায্যে। একার প্রচেষ্টায় নয়। একটা সময়ে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলোয় একটা দারুণ জায়গায় ছিলাম। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আশুতোষ কলেজ ছিল অপ্রতিরোধ্য। সেই সময় পরবর্তীকালেও সাফল্য অব্যাহত ছিল। তবে বড় ট্রফিতে আমরা তেমন সাফল্য পাচ্ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ সাফল্য বলতে কি চ্যাম্পিয়ান হওয়াকেই বোঝাচ্ছে?

কণিষ্ক ঃ হ্যাঁ, কারণ আমরা সত্তর দশক থেকে কোনো বড় ট্রফি জিততে পারিনি। তবে এটা ফুটবলে। Rowing, Athletics, Table Tenis-এ আমাদের সাফল্য অব্যাহত ছিল।

প্রশ্ন ঃ তুমি কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলে কবে? তারপর ইতিহাসটা একটু বল?

কণিষ্ক ঃ আমি কলেজে পড়তে এসেছিলাম ১৯৯৩ সালে। আমি প্লেয়ারস কোটায় ভর্ত্তি হয়েছিলাম। আমি ক্রিকেট খেলতাম আর কলেজ টিমে চান্স পেয়েছিলাম। কলেজ টিমের প্রথম খেলা খেলতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলাম। ম্যাচ বল ছিল না, খেলার অনেক সরঞ্জাম ছিল না। ফেরবার সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের হাতে টিফিন ও যাতায়াত বাবদ ২ টাকা করে দিয়েছিল। তবে এর আগে আরও একটা ঘটনা ভীষণ উল্লেখযোগ্য। ৯৩ সালে পরিবারের সঙ্গে বেনারস বেড়াতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার মারফত জানতে পেরেছিলাম যে আন্তঃ কলেজ খেলায় আশুতোষ নেতাজী নগরের কাছে ৭ - ০ গোলে হেরে গেছে। এই ঘটনা আমার মনে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছিল। সেই সময় আশুতোষ কলেজে আমার সিনিয়ার এবং কলেজের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা অলোক চৌধুরির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অলোকদার কাছে খেলাধূলা সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ নিয়ে যাই। কি ভাবে কলেজ টিমের উন্নতি সম্ভব — সে সমন্ধে আমার বেশ কিছু সাজেশ্‌নস আমি অলোকদাকে দিই। ১৯৯৪ সালে অলোকদা তৎকালীন ছাত্র সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে খেলাধূলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব নিতে বলে।

প্রশ্ন ঃ সেই সময় থেকেই কি তুমি খেলাধূলার ব্যাপারে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ো?

কণিষ্ক ঃ হ্যাঁ, পুরোপুরিই। ইতিমধ্যে ফুটবল মরসুম চলে এসেছিল। এবার শুরু থেকেই আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম একটা ভালো কিছু করতে হবেই। তবে একটা জিনিষ অবশ্যই বলার দরকার আছে— গতবারের ৭ গোল খাওয়া দলে তিনজন ইউনিভার্সিটি টিমের খেলোয়াড় ছিল। এবং এরা কেউই সেই বছরের কলেজ দলে ট্রায়াল দিয়ে ঢুকতে পারেনি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি ইউনিভার্সিটি ট্রায়াল কে প্রহসন বলা যেতে পারে?

কণিষ্ক ঃ আমি এই সমন্ধে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

আমরা প্রথমেই যোগাযোগ করি সাউদার্ন স্পোর্টস ক্লাবে ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্যের সাথে। উনি সেই সময় পিয়ারলেসের কোচ ছিলেন। আমরা ওনাকে কলেজ দলের দায়িত্ব নিতে বললে উনি ময়দানে আরেক প্রাক্তন ফুটবলার সুমিত বাগচীর নাম প্রস্তাব করেন।

প্রশ্ন ঃ সুমিত বাগচী বলতে আমাদের কোচ সুমিতদা?

কণিষ্ক ঃ হ্যাঁ, সুমিতদা। সেই থেকেই সুমিত বাগচী আশুতোষ কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে। সেই সময় একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী খেলাধূলার বিরোধী। আমি ওনার সঙ্গে দেখা করি এবং ওনাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলবার পর উনি বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য কে ফুটবল দলের টিডি ও সুমিত বাগচীকে কোচ হিসেবে নিয়োগপত্র দেন। এই সময় অলোকদা অসম্ভব সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন ঃ এই সময় অর্থাৎ ৯৪ সালে তুমি কি কোনো পদে ছিলে।

কণিষ্ক ঃ হ্যাঁ, ফুটবল মরসুমের পর ছাত্র সংসদের নির্বাচনে জিতে আমি কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক হই। এই সময় সাউদার্ন স্পোর্টস তাদের ব্যায়ামাগার, মাঠ ও টেন্ট আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছিল। এজন্যে তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন ঃ কেন? আমাদের তো ময়দানে টেন্ট ছিল?

কণিষ্ক ঃ থাকলেও সেই সময় কলেজ দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় সাউদার্ন স্পোর্টস এ খেলত। তাই প্র্যাকটিস করতে আবার ময়দান অবধি যাওয়ার অসুবিধা ছিল। এই সময় প্র্যাকটিসের পর খেলোয়াড়দের খাবারের সুব্যবস্থা হয়েছিল। যেটা আগে ছিল না। এই সমস্ত খেলোয়াড়দের স্পেশাল পারসেন্টেজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। প্র্যাকটিস চলাকালীন এরা কলেজের প্রথম দিককার ক্লাস মিস করলেও পারসেন্টেজ পেয়ে যেত। এই ব্যাপারে ডঃ চক্রবর্তীর অবদান অনস্বীকার্য।

এই সময়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে ইউনিভার্সিটি খেলা তিনজন খেলোয়াড় কলেজে ট্রায়ালে বাদ পড়ে। কলেজ দলে তারা আর জায়গা পায় ন। এই সময় ভাস্কর পাল অসম্ভব সহযোগিতা করে টিম তৈরি করবার ব্যাপারে। FCI এর রঞ্জন মাঝিকে কলেজে ভর্ত্তি করাবার জন্য ভাস্কর ও আমি বেশ কয়েকদিন তারকেশ্বরে ওর বাড়িতে যাই। এমনদিন গেছে যখন আমি আর ভাস্কর শুধু ছোলা বাদাম খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। এই সময় মেয়র একাদশের ফুটবলার সুদীপ মণ্ডলকে সিটি নাইট থেকে ট্রান্সফার করিয়ে কলেজে নিয়ে আসা হয়। সুদীপ মণ্ডল ছাড়াও জুনিয়ার ইন্ডিয়া খেলা সুদীপ নন্দীর সাহায্যও আমরা ভুলতে পারি না। আন্তরিকভাবে সেদিন থেকে আজও সে কলেজের পাশে আছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও নানাভাবে সুদীপ কলেজ ফুটবল দলকে সাহায্য করেছে।

শ্ন ঃ আমরা শুনেছি সেই সময় অনেক প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় কলেজের হয়ে খেলেছিল? সেই সমন্ধে যদি কিছু বল?

ণিষ্ক ঃ অবশ্যই। রঞ্জন মাঝি ছাড়াও সেই মরসুমের মোহনবাগান ক্লাবের অধিনায়ক বার্নাড ওপারোনাজি কলেজে বি.এ. (পাশ) কোর্সে ভর্ত্তি হয়। রোজ মোহনবাগান ও কলেজের অনুশীলন সেরেও বার্নাড নিয়মিত ক্লাস করত। বার্নাড এর অধ্যবসয় লক্ষ্য করে ডঃ চক্রবর্তী প্রথা ভেঙে প্লেয়ার্স কোটায় প্রথম অনার্স দেন। বার্নাড রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অনার্স) নিয়ে পড়তে শুরু করে। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের নিমা ভুটিয়া, বি.এস.এফ-এর প্রশান্ত দাস, পিয়ারলেসের সুব্রত মালাকার কলেজে ভর্ত্তি হয়। কলেজের ছাত্র — রাহুলহ নীলাঞ্জন ও দেবু (দেবব্রত) ও

নবারুণ খেলা ছাড়াও প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করে। এই সময়ই শ্রীকান্ত দত্তকে কলেজে re-admitted করিয়ে খেলানো হয়। শ্রীকান্ত যে কলেজে পড়ত এটা অনেকে জানত না। একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বড় টিমের খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিসের পরও কলেজ প্র্যাকটিস এ উপস্থিত থেকে অন্যদের উৎসাহ দিত। তৎকালীন কলকাতা সুপার ডিভিসনের টপ্ স্কোরার FCI এর দ্যিবেন্দু সাঁতরা (মোহনবাগানের চিমার সঙ্গে যৌথভাবে) কলেজের ভর্ত্তি হয় এবং কলেজ দলের হয়ে দারুণ খেলে।

প্রশ্ন ঃ এবার তুমি ফলাফল সমন্ধে কিছু বল?

কণিষ্ক ঃ ১৯৯৪ সালে ইউনিভার্সিটি খেলা হয়নি। ঐতিহাসিক ইলিয়ট শিল্ড বাতিল হয় কেবল মাত্র আশুতোষ ও নরসিংহ দত্ত কলেজ নাম দেওয়ার ফলে। হার্ডিঞ্জ হয়। আমরা নাম দিই। প্রথমে লালবাবা কলেজ, তারপর সিটি কলেজ অফ কমার্সকে বেশ বিরাট ব্যবধানে পরাস্ত করি। এরপর গতবারের বিজয়ী মতিঝীলকে আমরা বড় ব্যাবধানে হারিয়ে দিই। এরই মধ্যে কলকাতার বড় দলগুলি সিকিম গভরনরস গোল্ড কাপ খেলতে চলে যায়। পিয়ারলেস ও FCIও সেবছর যায়। তার ফলে আমাদের দল প্রায় প্লেয়ারশূন্য হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও ন' জন সেমিফাইনালে চিত্তরঞ্জন এর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করি। টাইব্রেকারে পরাজিত হই। এই ঘটনার পর যথেষ্ট ভেঙে পড়ে সবাই। তবুও জ্যাভোৎসব এ ৫-এ সাইড টুর্নামেন্টে আমরা রানার্স হই। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতার সমস্ত সেরা দল খেলেছিল। এই সময়ে আমরা বাস্কেটবলেও জয়ী হই। আমাদের দলে ৫ জন রাজ্যদলের খেলোয়াড় ছিল। পরবর্তীকালে অভিমুন্য সিং ন্যাশনাল খেলেছিল। টেবিল টেনিসেও আমরা বিজয়ী হই। ১৯৯৫ সালে রোয়িং-এ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান হই। এই সময় কলেজের অন্যান্য খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সময় কলেজের রোয়িং দলের একঝাক খেলোয়াড় যোগেশ চৌধুরি কলেজে চলে যায়। সেই সময় যথেষ্ট পরিশ্রম করে ক্যাথিড্রাল মিশন স্কুল থেকে রাজশ্রী গিরিকে কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। গিরি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপ্টেন ও ব্লু হয়। টিটিতেও আমরা অনেক সাফল্য পাই। এই সময়ই টিটিতে সুজয়, শিলাদিত্য ও ব্যাডমিন্টনে ইফ্তিকার আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু হয়। সাঁতারেও একজন ছাত্রের একক কৃতিত্বে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হই। অ্যাথলেটিক্স-এ আমরা দলগতভাবে তৃতীয় হই। ডঃ চক্রবর্তী মহিলা খেলোয়াড় নেবার বিশেষ নির্দেশ দেন। কলেজে ফুটবল দলে অনেক নতুন খেলোয়াড় উঠে আসে, এদের মধ্যে সুজয় ভাদুড়ী, কৃষ্ণাশিস দাস, শুভাশিস দাস, অজয় দাস, রাজু চ্যাটার্জি উল্লেখযোগ্য। রাজু চ্যাটার্জি এই সময় থেকে বেশ কিছু দিন কলেজের হয়ে অসাধারণ খেলেছিল। এই সময় আমাদের দ্বিতীয় গোলকিপার শক্তিও বেশ কিছু খেলায় অনবদ্য কিপিং করেছিল। দু'জন জুনিয়ার ছেলে সুমিত দাস ও মলয় ঘোষ রায় খুব নজর কারে। সুমিত দাস পরবর্তীকালে কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন হয় ও University টিমে চান্স পায়। আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খেলায় (হেরম্ব মৈত্র শিল্ড) আমরা পরপর মনীন্দ্র চন্দ্র (৩ - ০), নর্থ সিটি (১ - ০), বঙ্গবাসী (৬ - ০) পরাস্ত করি। কোয়ার্টার ফাইনালে সাডেন ডেথে আমরা মতিঝিল সায়েন্স-এর কাছে পরাজিত হই। এই সময়েই ১৮ বছর বাদে কলেজে প্রথম স্বীকৃত বড় ফুটবল ট্রফি আশে। আমরা শ্রীরামপুর কলেজ আয়োজিত উইলিয়াম কেরির নামাঙ্কিত কেরি কাপ জিতি। এই ঘটনা কলেজের ফুটবল ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যয়। এই সময় কলেজের খেলোয়াড় কুণাল চ্যাটার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে সহ অধিনায়ক হয়। বলা যায় আরও অনেক কথা। এই সময়ই রোয়িং-এ আমরা আবার জয়ী হই পরপর তিনবারের জন্য। সেন্ট জেভিয়ার্স গোল্ড কাপ-এ আমরা জয়ী হই।

আমার পরবর্তীতে ক্রীড়া সম্পাদক মহঃ আরিফ ছিল প্রচণ্ড উদ্যমী ও উদ্যোগী ছেলে, আরিফ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে কলেজের জন্য কাজ করে। আরিফ ক্রীড়া সম্পাদক থাকাকালীন আমরা আবার কেরি কাপ ও সেন্টজেভিয়ার্স গোল্ড কাপ জিতি। আরিফের সময়ও আমরা নিয়মিত ফুটবল প্র্যাকটিস করতাম। এই সময় আমি ক্রীড়া সম্পাদক না থাকলেও কলেজের খেলাধূলার সঙ্গে আগের মতো সক্রিয়ভাবেই যুক্ত ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ তুমি যদি এর পরের ইতিহাসটা বলো ।

কণিষ্ক ঃ সেই ইতিহাস আমার মনে হয় তুইও অনেকটা জানিস। তুই কলেজে এসেছিস বোধহয় ৯৬ সালে।

ঋতব্রত ঃ হ্যাঁ, আমি ৯৬ সাল থেকে কলেজে পড়ছি। তবুও তোমার মুখ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে বা আরও ভালভাবে বললে সবাইকে জানাতে চাই।

কণিষ্ক ঃ এর পর আমরা ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে পাই দেবমাল্য শীল ও সর্বজিৎ মজুমদারকে ওদের সময়ে ৩ নাইজেরিয়ান মোজেস্, অগাস্টিন ও লুকাসকে কলেজে ভর্ত্তি করানো হয়। এই সময় পরপর দুবছর আমরা বিশ্ববিদ্যালয় খেলায় প্রিঃ কোঃ ফাইনালে টাইব্রেকারে পরাজিত হই। তাছাড়া কেরি কাপেও টাইব্রেকারে হেরে যাই। এর পরের মরসুম অর্থাৎ ৯৯-এ আমি সেরকমভাবে যুক্ত ছিলাম না। ৯৯ সালে আমরা আবার টাইব্রেকারে বঙ্গবাসীর কাছে পরাজিত হই ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে। এ বছরেও থাকার ইচ্ছে ছিল না তবুও ঘটনাচক্রে এ কলেজের মোহ, হ্যাঁ মোহই অস্বীকার করতে পারিনি। এ কলেজ আমার কাছে মন্দির আর সে জন্যই ফিরে আসতে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কণিষ্কদা এত কথা তো বলা হল এবারে আসা যাক যে কথাটা শোনার জন্যই এত কথা তুমি এবারের কথা কিছু বল।

কণিষ্ক ঃ ৯৯-২০০০ মরসুম অবশ্যই আমাদের সেরা মরসুম। খেলোয়াড় ভর্ত্তি করানো হয়েছে বেশ বুঝে। FCI এর কোচ অলোক মুখার্জি ও আমাদের কোচ সুমিতদার সঙ্গে আলোচনা করে কিছু ভাল খেলোয়াড় নেওয়া হয়। কলেজে কমার্স না থাকায় আমাদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেননা অধিকাংশ খেলোয়াড় কমার্স পড়তে চায়। প্রথম ম্যাচে আমরা তো বেশ বিরাট ব্যবধানে মহেশতলাকে (৫ - ১) পরাজিত করি। কিন্তু কলেজ ও FCI এর নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার নির্মল আহত হয় FCI এর শিল্ড ক্লাস্টার খেলতে গিয়ে। পরের ম্যাচেও আমরা সহজেই যোগেশচন্দ্র কে (১ - ০) পরাজিত করি। এই ঘটনাগুলো তো তুইও সব জানিস কারণ তুইও সমস্ত ম্যাচের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলি।

ঋতব্রত ঃ তবুও তোমার মুখ থেকেই সবাই জানতে চায় আমাদের বিজয়গাথা।

কণিষ্ক ঃ এর পরে কোঃ ফাইনালে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। FCI ও SAIL এর লিগে রেলিগেশন খেলা ছিল। আমাদের দলে FCI ও SAIL এর বেশ কিছু খেলোয়াড় থাকায় আমরা দল নামাতে সমস্যায় পড়ি। আমরা প্রথমার্ধে দশজন খেলি। আমরা অতিরিক্ত তালিকায় মোল্লা, পাত্র, সমাদ্দার ও নবজ্যোতির নাম রাখি। এরা দ্বিতীয়ার্ধে এসে খেলতে নামে। ক্লাবের হয়ে খেলার পরও এরা ভাল খেলে এবং আমরা হেরম্বচন্দ্রকে (১ - ০) পরাজিত করি। এই জয়ের ফলে আমরা সেমি ফাইনালে পৌঁছে যাই। সেদিন কলেজের ছাত্রদের সমর্থনের কথা উল্লেখ করা অবশ্যই উচিত তার কারণ বৃষ্টি উপেক্ষা করেও তারা কলেজ দলকে সমর্থন করে।
এরপর সেই ঐতিহাসিক সেমিফাইনাল খেলা। ঐতিহাসিক কারণ বর্ণনা করলেই বোঝা যাবে। কোঃ ফাইনালের একদিন বাদে খেলা পড়লো আমাদের। আবার সেই এক সমস্যা। F.C.I. এবং SAIL দুটো টিমের খেলা পড়ল আবার। Universityকে সব জানিয়ে আমরা চিঠি দিলাম ও দেখা করলাম, বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদের নির্দিষ্ট দিনেই খেলতে হলো। আমাদের খেলা পড়ল উমেশ চন্দ্র কলেজের সাথে। উমেশ চন্দ্র কলেজ-এর ম্যানেজার সমর ঘোষ চিত্তরঞ্জন কলেজের টিমও দেখাশুনা করেন। এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে সব কিছু ব্যাখ্যা না করা গেলেও দু'চার কথা বলার দরকার আছে। আমাদের এমন পরিস্থিতি হলো যে আমরা বাধ্য হলাম সাত জনকে নিয়ে মাঠে নামতে — তাদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় গোলরক্ষক ও আরেকজন আহত। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আমরা টিমের অতিরিক্ত তালিকায় যে সব খেলোয়াড়ের নাম রেখেছিলাম তা পড়ে কেটে দেওয়া

হয় এবং প্লেয়াররা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের খেলতে দেওয়া হয়নি। রেফারি প্রথমে বললেন খেলানো যাবে যে কোন সময় Registration Card দেখিয়ে। তার খানিক পরেই আমরা দেখি উমেশচন্দ্র কলেজের সমরবাবু ও ইউনিভার্সিটির একজন অফিস স্টাফ মাঠে প্রবেশ করেন ও রেফারির সঙ্গে কথা বলেন এবং বলেন University Rule -এ খেলা হবে। অথচ নিয়ম হচ্ছে IFA Rule- এ খেলা হবে। এবং দেখা যায় University official রেফারিকে বলছেন আপনি যদি অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের পরে খেলতে দেন তাহলে আপনি অসুবিধেয় পড়ে যাবেন আইনের যাঁতাকলে। জানি না কি হলো, রেফারি প্লেয়ারদের খেলতে দিলেন না। পরে আমরা University Sports Board অফিসার সুদর্শনবাবুকে বলি। উনি বলেন এটা ঠিক হয়নি। আমরা বাধ্য হয়েই ৭জনেই খেললাম এবং তিন গোলে হেরে গেলাম। তবে আমি মনে করি আমরা হারিনি। আমরা সেই সময় সবাই খুব ভেঙে পড়ি। এতদূর এসেও সব শেষ হয়ে গেল। আমি সেই সময় সবাইকে সাহস যোগাই এবং বলি খেলা শেষ হয়নি, খেলা এবার শুরু হলো এবং আমরাই ফাইনাল খেলবো। আমরা তারপর সবাই আমাদের টেন্টে যাই এবং আলোচনায় বসি। সুমিতদা আমি, সজল, কৌস্তভ, তুই, রাণা, দেবমাল্য, সঞ্জীব আলোচনার পর ঠিক করি আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী।

এখানে একটা ব্যাপার বলা ভাল খেলার সময় আমাদের বাইরে থেকে কয়েকজন সাহায্য করেছিল যেমন দীপ্তি সেনশর্মা, সঞ্জয় পাল, বাপি দাস। এরা উমেশের বহু খেলোয়াড়কে চিনিয়ে দিয়েছিল যারা উমেশে পড়ে না এবং এদের বয়স ৩০এর বেশী (বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ২৫+ এর উপর খেলা যায় না) শুক্রবার অর্থাৎ খেলার দিন সন্ধে থেকে শুরু হল মাঠের বাইরের খেলা। শুক্রবার সন্ধে, শনি-রবি সারাদিন রাত আর সোমবার প্রোটেস্ট জমা দেওয়া অবধি কয়েকজন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছিল। এই টিমের প্রত্যেককে অর্থাৎ সজল, কৌস্তভ, দেবমাল্য, রাণা, সঞ্জীব, শুভাশিস আর তোকে অভিনন্দন জানাই। এই কদিন তোরা কজন যে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেভাবে দিনরাত আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিস সেজন্য সমগ্র কলেজের তোদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রোটেস্ট জমার দিন রাহুল ও ক্রিকেটার অভিষেকও যথেষ্ট সাহায্য করে। বহু আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য আমরা পেলাম এরপর। উমেশচন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করা হল আমাদের প্রতিবাদপত্রের ভিত্তিতে। আমরা প্রমাণ সহ প্রতিবাদপত্র জমা করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। তা গৃহীত হয়। এই ব্যাপারে যে সমস্ত মানুষজন আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। এই মাঠের বাইরের জয় আমাদের উদ্দীপ্ত করে তোলে আর ৩০শে সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি মাঠে উজ্জীবীত আশুতোষ কলেজের সমর দাসের একমাত্র গোলে দীর্ঘ সময়ের খরা কাটায়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সেরা হই।

ঋতব্রত ঃ কৃতিত্ব তোমরাও ।

কণিষ্ক ঃ আমরা ভুলতে পারি না রোজ আমরা ভোর ৫টায় বেরিয়ে রাত ১২টার আগে বাড়ি ঢুকি নি। দুপুরে খাওয়া হয়নি। শুভাশিস তো এই তিনদিন রাতে ওর বাড়িই ফেরে নি। এত খাটাখাটনির পর সাফল্য সত্যি বড় মধুর। আমরা এ ক'দিন কোথা থেকে কোথায় গেছি তা নিজেরাই বুঝতে পারিনি। সকাল ১০টায় ডানকুনি তো বেলা ১২টায় সন্তোষপুর, আবার বেলা ২টোয় ইউনিভার্সিটি — এরকমই ছিল আমাদের রুটিন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে আমার সমস্ত নির্দেশ তোরা সবাই বিনা কথায় পালন করেছিস। এজন্য তোদের কাছে আমি আবারও কৃতজ্ঞ।

প্রশ্নঃ যে সমস্ত ছেলেরা তোমাকে খেলার ব্যাপারে সবসময় সাহায্য করেছে তাদের সমন্ধে কিছু যদি বল।

কণিষ্ক ঃ আমি সম্পাদক থাকাকালীন বেশ কিছু নতুন ছেলে উঠে এসেছিল এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ক্রীড়া সম্পাদক হয়। দেবমাল্য, সুমিত সাহা রাণা সাহা, সর্বজিৎ, সৌরভ, সঞ্জীব। তবে সমস্ত কিছুর পরে আমি কাউকে ছোটো না করে দুজনের কথা বলছি যারা না থাকলে হয়ত কিছুই হত না। সজল বসাককে বলা যায় আমাদের ফুটবলযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত। দেবমাল্য শীলও সমান কৃতিত্বে ভাগীদার। ছাত্র সম্পাদক কৌস্তভও

সবসময় সাহায্য করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ করে সেমিফাইনালের পরের তিনদিন নানান প্রশাসনিক ব্যাপারে তোর অবদানও অনস্বীকার্য। আমি মনে করি আমার পরে ক্রিড়া সম্পাদক মহঃ আরিফ ও দেবমাল্য যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন ঃ এবার যদি শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু বল যারা খেলাধূলোয় সাহায্য করেছেন।

কণিষ্ক ঃ প্রথমেই বলতে হয় আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক অংশতোষ খানের কথা। সময়ে অসময়ে আর্থিক সাহায্য ছাড়াও আমাদের জন্য আমাদের 'একে' যুগিয়ে গেছেন অটুট আত্মবিশ্বাস। এমনকি প্রয়োজনে মাঠে উপস্থিত থেকেও তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি উনি খেলার ব্যাপারে আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস করতেন এবং ভরসা করতেন। এছাড়াও ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অশোক বসু শুধু মোহনবাগান ক্লাব নয় কলেজের জন্যও অনেক করেছেন। আমরা ওনার কাছেও কৃতজ্ঞ। তাছাড়া মাননীয় অধ্যাপক সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষের চেয়ারে থাকা অবস্থায় আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বিমলবাবুও (বিবি) খেলাধূলার বিষয়ে আমাদের অসম্ভব উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

প্রশ্নঃ এত দিনের কথ কথা তবু নিশ্চয় এমন কোনো ঘটনা আছে যা তোমার আলোড়িত করেছে গভীরভাবে।

কণিষ্ক ঃ অবশ্যই। বার্নাড ওপারোনাজি সে বছর মোহনবাগানের অধিনায়। মোহনবাগান লিগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার জন্য শেষ খেলা খেলতে নামছে। সেদিনই মতিঝিলের সঙ্গে আমাদের হার্ডিঞ্জ - এ খেলা। মতিঝিল গতবারের বিজয়ী। বার্নাড দুটো হলুদ কার্ড দেখার ফলে লিগম্যাচ খেলতে পারবে না। তবু পতাকা তুলতে হবে বলে মোহনবাগান ওকে ছাড়তে রাজি নয়। আমরা ডনবস্কো স্কুলের পাশে ওর ফ্ল্যাটে যাই খুব সকালে। মনে আছে একটাই কথা — Hallo Kanishka, today college match – O.K. আমি হতবাক হয়ে গেছিলাম কবে একবার খেলার Fixture দেখিয়েছিলাম আর তা মনে রেখেছে। যথাসময়ে মাঠে এসেছিল বার্নাড ম্যাচ জিতিয়ে ফিরে গিয়েছিল মোহনবাগা মাঠে পতাকা তুলতে। কলেজের প্রতি এ দায়বদ্ধতা আমাকে আজও বিস্ময়াচকিত করে।

ঋতব্রত ঃ সবশেষে তোমাকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

<u>অতীতে আশুতোষ কলেজকে যারা গর্বিত করেছেন ঃ</u>

১। চুনী গোস্বামী, ২। সমর (বদ্রু) ব্যানার্জি, ৩। সুকুমার সমাজপতি, ৪। চন্দন ব্যানার্জি, ৫। সৈয়দ নঈমউদ্দিন, ৬। মানস ভট্টাচার্য্য, ৭। সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার, ৮। রঞ্জিত ব্যানার্জি। ৯। শ্রীকান্ত ব্যানার্জি, ১০। বাবুল রায়চৌধুরি, ১১। ইন্দর বক্সি, ১২। দীপক মিত্র, ১৩। পূর্ণেন্দু সেন, ১৪। অলোক ঘোষ, ১৫। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ১৬। কৃশাণু দে

<u>অধ্যাপক — যারা কলেজের খেলার সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত ছিলেন ঃ</u>

১। প্রভাত রায়, ২। বিমল ভট্টাচার্য্য, ৩। প্রবীর রায়চৌধুরি, ৪। প্রণয় বল্লভ সেন, ৫। অশোক বসু, ৬। সুধীন ব্যানার্জি।

স্থানাভাবের জন্য যাঁদের নাম প্রকাশ করা গেল না তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

হেরম্ব মৈত্র শিল্ড জয়ী—

আশুতোষ কলেজ

ফুটবল দলকে

আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন

আশুতোষ কলেজের

শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা

"শোন্‌রে মালিক, শোন্‌ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে/মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।"

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

"তাই দেশে দেশে যত প্রতিরোধ
তারি মাঝে তুলি রক্তের শোধ
নানকিং আর প্যারীর যুদ্ধে
আমরাই সাথে আছি
কাকদ্বীপে ম'রে আমরা আবার
তেলেঙ্গানায় বাঁচি।"

— সলিল চৌধুরি

প্রলয়ঙ্করী প্লাবণে শারদোৎসবের সমস্ত উচ্ছ্বাস
আর অস্তিত্ব যাঁদের বিপন্ন তাঁদের প্রতি গভীর
এবং সক্রিয় সহমর্মিতায় আমরা দায়বদ্ধ।

—সম্পাদকমণ্ডলী